সুধীরচন্দ্র কর

জনগণের রবীন্দ্রনাথ

সিগনেট প্রেস : কলিকাতা ২০

সূচীপত্র

জনগণের রবীন্দ্রনাথ

জনগণের রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বব্যাপী আজ জনজাগরণের দিন। জনগণ, দেশের অধিকাংশ লোক, যারা চাষাভুষা কুলি-মজুর অর্থাৎ খেটে খাওয়ার দল—এদের সঙ্গে আজকের দিনের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের যোগ, ভাবে ও কর্মে কোথায় কতটা—এটি একটি সাধারণ কৌতূহলের বিষয়। কবির এই পরিচয় বিশদভাবে আলোচনার যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার, কৃষকরা তাঁর প্রজা, সুতরাং তাদের সঙ্গে স্বভাবতই তাঁর যোগ থাকবার কথা। জনগণের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক যোগ জমিদার হিসেবেই। কিন্তু খাজানা আদায় এবং বিষয়-ব্যবস্থার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর মন জমিদারসুলভ মানসম্ভ্রমের বেড়া পেরিয়ে যেত সাধারণের কাছে। তারা জানতও না কখন কোন মাঠে-ঘাটে অলিতে-গলিতে তাঁর সেই মনের আনাগোনা। 'ছিন্নপত্র', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী', 'ক্ষণিকা', 'গল্পগুচ্ছ', 'পঞ্চভূতের ডায়ারী' ইত্যাদিতে সেই দরদী কবির সন্ধান মেলে। এক কথায় শিলাইদা-অঞ্চলের জীবনই তাঁর কৃষক বা সাধারণের জীবনের কাছাকাছি জীবন।

অবশ্য আর একবার সেই জন-যোগের প্রবণতা দেখা যায় তাঁর

শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবাক্ষেত্রে। তবে এখানে আদর্শের তাগিদে তাঁর প্রবর্তিত কর্মের সূত্রে যোগ হয়েছে, ঠিক কাছাকাছি যাওয়া নয়।
এর পরে কবি গেলেন বিদেশে—রাশিয়ার সাম্যবাদীরা তাঁকে নিয়ে দেখালেন তাঁদের নবজীবন গড়ার কাজ। পল্লীকেন্দ্রে ঘুরে তাদের সংঘবদ্ধ সুসংস্কৃত জীবনকে তিনি অভিনন্দন জানালেন। রাশিয়ার জনসেবাপ্রণালী এবং দেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশার আলোচনায় পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'।
জন্মেছিলেন ধনীগৃহে। আভিজাত্যের পরিবেশে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, জীবন যাপন। বড় বড় বিদ্বান গুণীমণ্ডলী পরিবৃত হয়েই কেটেছে তাঁর সারা জীবন—বনেদী বিষয়, ভাষা ও তত্ত্বের মধ্যে ছিল তাঁর মানস পরিক্রমণ। তারও ফাঁকে ফাঁকে তাঁকে বিচরণ করতে দেখি কৃষকপাড়ার লোকসংস্কৃতিবাহিত রসসুরধুনীর তীরে তীরে। ছড়া, কবি, বাউল, বৈষ্ণবপদাবলী, টপ্পা, পাঁচালি—এ সবেও তাঁর অনুরাগ ছিল আন্তরিক, এ সবের সংগ্রহ, সংকলন, তত্ত্বব্যাখ্যা ও রসপরিবেশনে তাঁর সাহিত্যিক উদ্যম অনেকখানি নিয়োজিত হয়েছে। নিজের অনেক গানের মধ্যে কথায় সুরে রেখে গেছেন তিনি লোকসাধারণের সঙ্গে 'নাড়ীর টানে'র প্রগাঢ় বেদনা।
এই বেদনা ছিল সাধারণের অভিমুখী; কিন্তু জন্ম-অভ্যস্ত আভিজাত্যের গণ্ডীই ছিল জনগণের কাছাকাছি আসবার পথে প্রবল বাধা। মননে থাকলেও অভ্যাসে তিনি সে গণ্ডী ঠেলে জনগণের ব্যবহারিক সাধারণ জীবনে চলে আসতে পারেননি। রাশিয়ার সাম্যবাদের প্রতিক্রিয়া তাঁর জীবনেও তোলপাড় যে কিছু না তুলেছিল এমন নয়—জনগণের ব্যথা বুঝেছিলেন, নিজের সাময়িক অভাবগ্রস্ত জীবনের ব্যথা দিয়ে। দ্বিতীয় খণ্ড 'চিঠিপত্রের' মধ্যে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে জীবনধারা পরিবর্তনের সংকল্পও একসময়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কার্যত পরিবর্তন হয়নি। জনগণ

থেকে দূরে থাকার বেদনা ভিতরে ভিতরে তাঁকে পীড়িত করেছে; সে বেদনা একবার প্রথম দেখা দিয়েছে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়, শেষে দেখা দিল 'ঐকতানে'।

পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার। ..
জীবনে জীবন যোগ করা
না হোলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

ভিতরে প্রবেশ বা 'জীবনে জীবন যোগ করা' বলতে যেভাবে যতটা কাছে থাকার জন্য তাঁর এই ব্যগ্রতা, ততটা না ঘটলেও, দূরে থাকতে থাকতে জনগণের জন্য যতখানি করেছেন, তাঁর সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে তা একান্ত দুর্লভ। তাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ও বক্তৃতার ব্যবস্থা, লোক-শিক্ষার সংস্থান, আর্থিক উন্নতির জন্য কৃষি, কুটির-শিল্প ও সমবায় ধনভাণ্ডার প্রবর্তন, স্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যসমিতি, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এবং কিশোরদের সেবা, শৃঙ্খলা ও খেলাধুলার কাজে সংঘবদ্ধ করার জন্য ব্রতীদল প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানে তিনি নানা উদ্যোগ করে গেছেন। তাঁর মতে একটি পল্লীকেও যদি একস্থানে সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে আদর্শ পল্লী করে গড়ে তোলা যায়, তবে তার থেকেই দেশের বৃহত্তম কল্যাণের সূচনা হবে। তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্র শাখা-প্রশাখায় ভারতবিস্তৃত ছিল না। এদিকে তাঁর কর্মপ্রণালী ছিল কেন্দ্রস্থিত করার দিকে ব্যাপকতার দিকে নয়। তাই তা একটি আন্দোলনের রূপ নিয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি। শ্রেণীসংগ্রামের সচেতনতা তখনো আসেনি, কিন্তু গানে, বক্তৃতায়, লেখায় স্বদেশীযুগে জাগরণের কথা বলতে গিয়ে, দেখা যায় চাষী-মজুরদের কথাও কবি সেই সঙ্গে গেয়ে চলেছেন। 'যেথায় থাকে সবার

অধম দীনের হতে দীন' গানে তথাকথিত সর্বহারাদের প্রতি সম-ব্যথার স্রোতই প্রবাহিত। 'দুর্ভাগা দেশ যাদের অপমান' করেছে, সেই 'মাটি ভেঙে যারা চাষ করছে, পাথর ভেঙে যারা পথ কাটছে, যারা বারো-মাস খাটছে—রৌদ্রজলে, দু'হাতে ধুলো লাগিয়ে যারা জীবনযাত্রা চালাচ্ছে—সবাই এরা এক শ্রেণী, এবং দেবতা গেছেন এদের মধ্যে—সেইখানেই এদের সঙ্গে মিলে কাজ করলে তা দেবতার পূজা করা হবে'—এ কথা বলেছিলেন সেদিন রবীন্দ্রনাথ।

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন 'পরে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখোরে ধ্যান, থাক্‌রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধূলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে॥

যতটুকু পেরেছেন, প্রিয় প্রতিষ্ঠান শ্রীনিকেতনে এই 'ঘর্ম ঝরে পড়া'র কর্মযোগেরই তিনি সূত্রপাত করে গেছেন। তবে তা রাজনৈতিক প্রগতির কাজ নয়। তাঁর ধারা গঠনমূলক কাজের। দেশের মুক্তিতে সেটাও যে কতখানি অপরিহার্য তা দেখা যায় মহাত্মাজির ক্ষেত্রেও। তিনি একদিকে যেমন সাংগ্রামিক অন্যদিকে তেমনি গঠনশীল। আইন-অমান্য আন্দোলনের পর দেখা দেয় 'নিখিল-ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘ।' রবীন্দ্রনাথ এক দিকে সাংগ্রামিক তাঁর চিন্তায়, তাঁর লেখায়, অন্যদিকে কাজের ক্ষেত্রে গঠনপন্থী। মহাত্মাজির আইন-অমান্য আন্দোলনের মূল পরিকল্পনা দেখা দিয়েছে প্রথম রবীন্দ্রনাথেরই

নাট্যসাহিত্যে। 'প্রায়শ্চিত্তে', 'মুক্তধারা'য় প্রজাদের মধ্যে যে উত্তেজনা তা রাষ্ট্র-অত্যাচারের প্রতিকারে 'খাজনাবন্ধ' আন্দোলন নিয়ে। 'গোরা'তেও জনগণের কথা আছে এবং তাতে দেখা যায় তাদের হয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর 'গোরা' নেমেছে সংগ্রামে।

শেষদিনগুলিতে, এই অখ্যাত নির্বাক জনগণের অস্তিত্বের সত্যতা এবং বাঁচবার দাবি যে শুধু তাদেরই আছে, সে সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস আরো দৃঢ়তর হয়েছে। 'ওরা কাজ করে'—ওরাই চিরকাল টিঁকে থাকবে, আর সকলে যে-ই যত প্রবল হোক—

জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল,
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

* * *

শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-পরে
ওরা কাজ করে॥

ওদের এই জীবনীশক্তির উপর ভরসার মধ্যেই কবি কৃষক-মজুরদের, এই জনগণের প্রতি রেখে গেছেন তাঁর আন্তরিক আশীর্বাদ। তাদের জন্য কালোপযোগী প্রগতিমূলক নতুন ভাবের কর্মক্ষেত্র বা কার্য-পদ্ধতি রচনা করবার কথা তাঁর মনে এসেছিল কি না জানিনে, তবে নতুন কিছু করবার সময় আর হল না। দেশের জনগণের ভয়াবহ দুর্দশার জন্য শাসক-সম্প্রদায় তথা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কর্ণধার ইংরেজদের ধিক্কার জানিয়েই তিনি আগামীকালের জন্য এক শঙ্কা এবং সেই সঙ্গেই নতুন যুগে এক মহামানবের আবির্ভাব-আশা রেখে

গেলেন তাঁর শেষ ভাষণ 'সভ্যতার সংকটে'। কিন্তু এ সময়েও একটা বিষয় লক্ষণীয়।

কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন কৃষক-প্রজাদের মধ্যে, ছেদ টানবার দিনেও তারাই দেখি এসে পড়েছে কখন তাঁর বিদায়-অঙ্কের এক পাশে। কবি তখন সব দিক থেকে বিদায় নিচ্ছেন। এই সময়ে বার্ধক্যজীর্ণ রোগক্লিষ্টদেহেও বিদায় নিতে গেলেন শিলাইদহের জমিদারিতে সুদূর মফঃস্বলের পল্লী অঞ্চলে। বর্ষার জলকাদা বা দূর-পথের কষ্ট তাঁকে ঠেকাতে পারেনি। সেখানে রায়ত-জমিদারের সেলামি-দরবারের সম্বন্ধ নয়, মানুষের প্রতি মানুষের আত্মিক সম্বন্ধের টানকেই কবির জীবনে জয়যুক্ত হতে দেখি। শান্তি, সাম্য পৃথিবীতে কবে আসবে সে ভবিতব্যই জানে, কিন্তু এই আত্মিক প্রীতি-সম্বন্ধের উপরেই হওয়া চাই তার মূল ভিত্তি। ছোট-বড়োর শ্রেণীভেদ একভাবে না একভাবে সমাজের বুকে থাকবেই; কিন্তু পরস্পবের সম্বন্ধটি হৃদ্য হলে সমস্যার সমাধান সকল কালেই সহজ হবে। পাশ্চাত্ত্য সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষানবিশির দিনে বেদনাপ্রবণ আদর্শবাদী এই প্রাচ্য কবির প্রাণযোগের বাণীও আমাদের সমভাবেই স্মরণীয়—'মানুষের সঙ্গে মানুষেব যে বাঁধন তাকে মানতে হবে।' সর্বপ্রকার 'ইজ্‌ম' বা 'বার্ষিক প্ল্যান' ইত্যাদি এক দিকে, অন্যদিকে কবির এই প্রাণগত সম্বন্ধ। এই প্রাণের টান ছিল বলেই একদিন জমিদার রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর এক নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য মানুষের মহান মর্যাদায় অমর হয়ে বযেছে তাঁরই সাহিত্যে। সেখানে সে শুধু একজন ছোটলোক বা কোনো একটি চাকর মাত্র হয়ে নেই—অনেক বড়লোকের বড়ো ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করে সে হয়ে উঠেছে একজন বিশেষ মানুষ। সাম্যবাদের প্রসারেব দিনে এই বিশেষেব স্থান সম্বন্ধেই ছিল তাঁর বিশেষ চিন্তা। রাশিয়া ভ্রমণ করে এসে এই আশঙ্কা ও সতর্কবাণীই রেখে গেছেন তিনি ভাবী যুগের সমাজ-

ব্যবস্থা লক্ষ্য করে। যে সমাজে ব্যক্তি এই বিশেষত্বের মর্যাদা পায় সেই সমাজই রবীন্দ্রনাথের কাম্য আদর্শ সমাজ।

বণিক বা ধনিক সম্প্রদায় প্রভাবিত কলকারখানার তৈবি শ্রেণী-প্রধান সভ্যতার চাপে ব্যক্তি দাঁড়ায় একটি সংখ্যা বা য়ুনিটের সামিল হয়ে—কলের যুগে মানুষের এই কেজো পরিণতির প্রতিবাদ বিদ্রোহ আকারে দেখা দিয়েছে 'রক্তকরবী'তে।

তার আগে 'অচলায়তনে'ও দেখি বিদ্রোহ। সামাজিক পরিবেশ থেকে তার প্রসার। সমাজে আচার-বিচারের বাড়াবাড়ি। মানুষকে, বিশেষ-ভাবে চাষাভুষা কুলি-মজুরদের, বিশেষত্বহীন করে সাধারণ এক অস্পৃশ্য শ্রেণীতে অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছিল। মানুষের প্রগতিতে এই আর-একদিক থেকে আর-এক রকমের বাধায় কবি সমস্ত সমাজের অচল অবস্থার দারুণ দুর্গতি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি সমগ্র সমাজের প্রগতির জন্য শ্রেণী বিশেষের অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

জনসাধারণের দিক থেকে রাষ্ট্র-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-সুর জেগেছে 'তপতী'তে। অবশেষে 'কালের যাত্রা'য় কবি দেখিয়েছেন 'শূদ্রদের জয়'। বলে গেছেন—'ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ...এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদের সঙ্গে সমান হয়ে।' কালের যাত্রায় বিশ্ব-মানবযাত্রীর উদ্দেশে কবির বিশেষ নির্দেশ 'অন্তরের তাল মানের উপর' বিশ্বাস রাখার জন্য।

নিজে সুন্দরের উপাসক হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'অস্ত্রের কঠোর' 'শাস্ত্রের কঠোর' উভয়ের পথ বর্জন করেছেন এবং 'বাইরের ঠেলা মারার উপর বিশ্বাস' রাখতে না পেরে 'অন্তরের তাল মানে'র গানই অন্তরের তাগিদে গেয়ে গেছেন বরাবর। কর্মক্ষেত্রে সাংগ্রামিক না হয়ে সংগঠনশীল হওয়ার মূল কারণও মনে হয় তাঁর প্রকৃতিগত বিশিষ্ট সৃষ্টি-প্রেরণার মধ্যেই বর্তমান। সংগ্রাম হচ্ছে ভাঙার, আর সংগঠন হচ্ছে সৃষ্টি বা

গড়ার দিক। ভাঙা ও গড়া এই দুই ধারারই প্রয়োজন আছে। একটি আর-একটির পরিপূরক। গড়ার থেকে হয় শক্তি সঞ্চয়, আর জীর্ণ, অসত্য, অন্যায়কে ভেঙে ফেলে সেখানে হয় সত্য বা ন্যায়—অর্থাৎ কিছু 'হ্যাঁ'-এর প্রতিষ্ঠা। নয় তো শুধু ভেঙে গেলে, ভাঙবারই বা শক্তি জোগাবে কোথা থেকে? তাতে ভাঙা জায়গায় 'না'-এরই অর্থাৎ শূন্যেরই বিহারস্থল হয়ে সবটাই শেষে নিরর্থক হয়ে যাবে। মহাত্মাজির অসহযোগ আন্দোলনে সংগ্রামের অর্থাৎ ভাঙার দিকটাই ছিল মুখ্য। রবীন্দ্রনাথ সেদিক দিয়ে তাকে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু নিজে তখন গড়ে চলেছেন গ্রামোদ্যোগের কাঠামো। শালিসী, ধর্মগোলা, স্বাস্থ্য, কুটির-শিল্প, শিক্ষা, ব্রতী আন্দোলন, সব কাজের মধ্যেই অসহযোগের পরিপূরক ইতিমূলক দিকটা নিয়ে তাঁর কাজ চলেছে অনাড়ম্বরে। সংগ্রামে না হোক, সংগঠনের দিকে রবীন্দ্রনাথের কীর্তি জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাঁর প্রতিষ্ঠান জনগণেরই সেবার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

সংগ্রামের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির ভয়ে যে তিনি পশ্চাৎপদ হয়েছেন তা ধরে নিলে তাঁর প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হবে। বস্তুত সংগ্রামের পথ তাঁর আদর্শের প্রতিকূল বলেই তিনি তা পরিহার করে চলেছেন। কিন্তু যে-সৃষ্টিধর্মী অস্তিমূলক আদর্শ-রূপায়ণের পথ তিনি ভিতর থেকে পেয়েছিলেন সে-পথে এগিয়ে চলতে মুহূর্তের জন্যও কখনো তিনি ক্লান্ত হননি, বরং অবিশ্রাম এগিয়ে চলতে গিয়ে অর্থ, মান, স্বাস্থ্য, সংসার, সময় সবই উপেক্ষা করেছেন।

আসলে তিনি ছিলেন স্রষ্টা। মূলত তাঁর ছিল সৃষ্টির ধর্ম। 'না'-এর পথ নয়, 'হ্যাঁ'-এর পথেই তাঁর চলার প্রবণতা। যে জিনিসটি তিনি চেয়েছেন, মানসে তার রূপটি যেমন উদ্ভাসিত হয়েছে, বাস্তবে তাকেই রূপায়িত করতে তিনি আনন্দ পেয়েছেন। যেটা তার বিরুদ্ধ বা বিকৃত সত্তা সেটাকে ভেঙে স্যারিয়ে বা সরিয়ে দিয়ে কাজ চালাবার

ব্যবহারিক হিসেবী বুদ্ধি তাঁকে সংস্কারক বা বিপ্লবীর ভূমিকায় নামাতে পারেনি। প্রচলিত সমাজগত মানুষের বিধ্বস্ত, বিকৃত, দুঃখক্লিষ্ট রূপ তাঁকে ব্যথিত করেছে জীবনের শুরু থেকেই; শুদ্ধ, সুস্থ, সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষের পরিপূর্ণ আদর্শ খুঁজে বেড়িয়েছেন, বাস্তবে তার নিতান্ত অভাব বোধ করে! সেই আদর্শ তিনি খুঁজে পেলেন শাস্ত্র ও প্রাচীনসাহিত্যগত পৌরাণিক ভারতের আদর্শ-মানব—ব্রাহ্মণে। দেখলেন তা গড়া হয়েছে তপোবনে। তখন তপোবনের আদর্শ তাঁকে পেয়ে বসল। দেশের কল্যাণে কোন কাজটা অনুচিত কোনটা অসম্ভব, কারো সঙ্গে সেই নিষ্ফল বাদপ্রতিবাদে একান্তভাবে না মেতে নিজে যা শ্রেয় মনে করেন, যা তাঁর ধারণায় হওয়া সম্ভব, বাস্তব শ্রেয়ের সেই 'ইতি'মূলক সার্থক রূপ দেখার আগ্রহেই তিনি তখনকার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে এলেন; এলেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মানুষ গড়ার কাজে; সে কাজের পথ তাঁর কাছে হল শিক্ষা। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করে আদর্শ জীবন ও পরিশুদ্ধ সংস্কৃতি বিস্তার করে দেশে সমন্বিত মনঃপ্রকৃতি সৃষ্টির কাজে লাগলেন এসে শান্তিনিকেতনে। পরে কালক্রমে নানা দেশে গিয়ে নানা সমাজ. নানা চিন্তাধারা, নানা শিক্ষাপ্রণালীর সংযোগে এসে তাঁর প্রাথমিক ব্রাহ্মণিক আদর্শ পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিল বিশ্বমানবে। নর-দেবতায় তার শেষ পরিণতি। 'হেথায় দাঁড়ায়ে, দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে'—এই বলে গানের মধ্যে একদিন যে ভারত-তীর্থের দেবতাকে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন, এতদিনে তাঁরই পূজা-মন্দির গড়ে স্বপ্নকে করলেন বাস্তব। সর্বদেশকে স্বদেশের মধ্যে স্বীকার করে তাদের সকলেরই মেলবার নীড় রচনার আয়োজন করলেন শান্তি-নিকেতন আশ্রমে 'বিশ্বভারতী' অনুষ্ঠানে।

সবটা ঠিক আদর্শমত না হতে পারে, বা আদর্শেও ত্রুটি থাকা বিচিত্র নয়, কিন্তু কবির মন চেয়েছে—এই আশ্রমে বিশ্বভারতীর শিক্ষায় যে

মানুষ গড়া হবে, সেই আদর্শ মানুষেরাই বা তাঁর মানুষের ধ্যানগত আদর্শই দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে নতুন এক মানবসমাজের সৃষ্টি করবে। পুরানো দুর্গতদেরও রূপান্তরিত করবে সেই নতুন মানুষ—যাদের সুগঠিত সংস্কৃতিবান জীবনচর্চা থেকে দেশের সর্বপ্রকার অকল্যাণ দূর হয়ে গিয়ে সর্বত্র দেখা দেবে দেহে মনে স্বাস্থ্যবান স্বাধীন মহান এক সংঘবদ্ধ বিশ্বমানবসমাজের মানুষ।

এই বিশ্বমানবসমাজেই আছে স্বদেশের জনগণ। তাদের মুক্তির কাজ, এই আদর্শ জীবন ও সংস্কৃতি গড়ার কাজের মধ্যেই আছে মিলিয়ে। তাই তাঁর শান্তিনিকেতনের এই কাজ শুধু ভারতের একটি বিশেষ দেশের জনগণের কাজ নয়, সেটি বিশ্বের সমস্ত দেশের সকল জনের কাজ, জাতিবর্ণনির্বিশেষে মানুষের কাজ। বিশ্বের জ্ঞানী গুণী উচ্চশ্রেণীই নয়, মূঢ়, মূক জনগণও নিশ্চিতই বলতে পারে—রবীন্দ্রনাথ আমাদের, রবীন্দ্রনাথের কাজ আমাদেরও কাজ। সত্যি, যেদিন চারদিক থেকে তারা বলবে, বিশ্বভারতী আমাদের, এর ভালো-মন্দ, অভাব-অসুবিধা, আপদ-বিপদ, সুখ-সম্পদ সব দায়িত্বে আছে আমাদের অংশ—কেননা আমাদের জন্যই কবি একে গড়ে গিয়েছিলেন, সেদিনই সার্থক হবে কবির শান্তিনিকেতন-জীবনের আদি প্রেরণা। সাধারণকে শিক্ষা দিয়ে প্রেরণা যুগিয়ে ভাবতে শিখিয়ে যে পরিমাণে এই দাবি এই কর্তব্যে তাদের সচেতন করে সক্রিয় ও দায়িত্বশীল করে তুলতে পারবেন, বিশ্বভারতী সেই পরিমাণেই হবেন মৃত্যুহীন গতিতে বিশাল হতে বিশালতর: অনুষ্ঠানটি সেই পরিমাণেই হবে সার্থক।

বিরাট কাজ কবি শুরু করে গেছেন মাত্র; তার সম্পূর্ণতা বহু দূর কাল ব্যাপ্ত ক'রে। শুধু সাহিত্য, শিল্প বা আপিসের রুটিন-বাঁধা কাজে এক-একজন কৃতী হওয়া নয়—আচারে-ব্যবহারে, চিন্তায়-কথায়, দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্র-আদর্শের ধারাবাহী হওয়া,

সর্বমানবিক কাজে কিছু-না-কিছু যোগ রাখা—শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শে রয়েছে মানুষকে তেমনি করে তৈরি করার দায়িত্ব। শিল্প সাহিত্যাদির চর্চাও খুবই প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে আছে মানুষের ব্যবহারিক জীবন-গড়ার কর্তব্য। কারণ, শুধু বিদ্যাচর্চা নয়, বিদ্যাকে আশ্রয় করে মুখ্যত জীবন-গড়ার কাজ নিয়েই তো কবি এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর আদর্শানুরূপ মনুষ্যত্বের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ এক-একটি ব্যক্তি-জীবনকে দেশের কাজে উপহার দেওয়াই ছিল তাঁর সংকল্প। আশ্রমের গোড়াপত্তনের দিনে মনুষ্যত্বে দীন দেশের এই অধিকাংশ দুঃস্থ-জনগণের কথাই তো ছিল তাঁর মন জুড়ে—মনুষ্যত্বের দুর্দশা পরাধীন দেশে অধঃপতিত মানুষের অবমাননার জ্বালাই ছিল তাঁর কাজের অন্যতম প্রবর্তনা—বলেছিলেন—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

দেখা দরকার নিছক বিদ্যা বা বৃত্তির সাধনায় তাঁর শিক্ষার ক্ষেত্রে, রবীন্দ্র-সংস্কৃতির যে-কোনো সাধনাক্ষেত্রে, সে শান্তিনিকেতনে বা বাহিরে যেখানেই হোক, এই জনগণের কথা যেন ম্লান না হয়, সেদিকে কিছুমাত্র ঔদাসীন্য বা উপেক্ষা এলে সেটা হবে শোচনীয় আদর্শচ্যুতি। সংস্কৃতিচর্চার অনুষ্ঠানের এই একটা শঙ্কাপূর্ণ পরিণতির দিক আছে। সেক্ষেত্রে অনেক সময়ে আভিজাত্যের সংক্রামকতায় স্পর্শকাতর রুচিবিকারে দেখা দেয় লোকসমাজের প্রতি উপেক্ষা।

কবির নিজের জীবনই এ বিষয়ে অনেকটা শিক্ষাস্থল। আভিজাত্যের

চূড়ায় বসে সাহিত্য ও সংগীত চর্চায় তিনি ছিলেন মগ্ন। সেই আভিজাত্য যদিও তাঁর আপন বিলাসেরই জন্য আপনার ইচ্ছায় গড়া নয়, জন্মসূত্রে তাতে তিনি বর্ধিত মাত্র এবং তাঁর সাহিত্যানুশীলন যদিও ছিল ফাঁকিশূন্য একনিষ্ঠ সাধনায় মহৎ, তবু সেই জনস্পর্শ-হীন উত্তুঙ্গ বিদগ্ধমণ্ডলের বিশেষ গণ্ডীর জীবন তিনি স্পৃহণীয় বোধ করলেন না। সে গণ্ডী থেকে এই বলেই সরে এলেন শেষে বিশ্বজীবনের কাজে—

কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি॥

বললেন—

স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা।

কবির কাজ করে কবি চলে গেছেন। তাঁর বিদেহী সত্তা রয়েছে তাঁর সাহিত্যে ও শিল্প-রচনায়। রয়েছে কর্মানুষ্ঠান বিশ্বভারতীর নানা কর্মধারার উদ্দেশ্যের মধ্যে। রয়েছে তাঁর আরব্ধ অসম্পূর্ণ কর্মে।

শিক্ষিতেরা তাঁকে সে সকলের মধ্যে পেতে পারেন। কিন্তু আজ তাঁর সঙ্গে জনগণের যোগসাধনের উপায় কি? বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথকে সব দিকে বোঝবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি রুচি, এককথায় মনঃপ্রকৃতির সামর্থ্য, জনগণের নেই। অত বড়ো কবি-মনীষীর দানে তাই বলেই কি মানুষের এত বড়ো একটা অংশ বঞ্চিত হয়ে থাকবে?

জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা, বেদনা, উদ্দীপনা প্রকাশ পায় তার গানে। সেদিক থেকে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ জাতির মর্মপ্রকাশক। দেশজ লোকশিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে গান ও ছড়া। এখন কবির বিষয়ে বক্তৃতা বা তাঁর পুঁথিপত্র প্রচারের পাশাপাশি তাঁর গান ও বিশেষ বিশেষ কবিতাগুলি জনগণকে শোনাবার ও শেখাবার ব্যবস্থা করলে দেশজ স্বাভাবিক শিক্ষাপথেই তারা তা নেবে সহজে। এই ভাবে গান ও কবিতার খাতে রবীন্দ্র-সংস্কৃতি ঘরে ঘরে বয়ে যাবে, জনগণের অন্তরের জিনিস হয়ে। অন্য অনেক উপায়ের মধ্যে এটিই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে জনগণের কাছে নেবার অপেক্ষাকৃত সহজ, স্বাভাবিক অথচ আনন্দদায়ক উপায়। জনসাধারণ কবির গান শুনে বা গেয়ে মুগ্ধ হলে কবিকে আপন করে জানবে। তখন আপন আগ্রহেই তারা ক্রমে ক্রমে বিচিত্র দিক থেকে কবিকে বোঝবার চেষ্টা করবে এবং তখন কেউ বোঝাতে গেলে শ্রদ্ধা ও আগ্রহভরে তারা নিজেরাই বুঝে নেবে।

রবীন্দ্র-সংস্কৃতি সমগ্র মানবজাতির এক পরম সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষকে যত বেশি দিন সেই সংস্কৃতির যোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখা হবে, বিদেশের প্রবুদ্ধ জনগণের কাছে এ দেশের মানুষকে ততই নিচু হয়ে থাকতে হবে।

সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র-সংস্কৃতির মুখ্য প্রকাশ। লোকশিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ, কুটির-শিল্প ইত্যাদি গঠনমূলক কাজের ধারা আজ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানমাত্রেরই কিছু-না-কিছু আছে, তা দিয়ে বাস্তব জীবনের কিছু উন্নতি হলেও রবীন্দ্রনাথের দানের

অভাব কিছুতেই মিটবে না। এই সব দিক দিয়ে জীবনকে সঞ্জীবিত করে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির শিখার ছোঁয়ায় সেই দেউলে জ্বালাতে হবে জনগণের মনের আলো। সেই বিশিষ্ট জীবন-শিল্পের ছন্দে উদ্দীপিত জীবনে জনগণকে উন্নীত করতে হলে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির বহুমুখী ধারার মধ্যে একাধারে সাহিত্য ও শিল্প হিসেবে সংগীতই যে সহজগ্রাহ্য ও কার্যকর পথ, তার ইঙ্গিত মেলে অন্য দিক থেকেও। অন্যান্য দেশে গণ-আন্দোলনের অস্ত্র হিসেবে সংগীত ও নাট্যকে দেখা যায় অন্যতম রূপে। আজকের দিনে অন্যান্য দেশের কথা ছেড়ে দিলেও দেখা যাচ্ছে, এ দেশেও গণ-আন্দোলনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এই গান ও নাট্যের পথেই কিছু কিছু কাজ শুরু করে দিয়েছেন। রবীন্দ্র-সংস্কৃতি সহজলভ্য নয়। কিন্তু তা হলেও রবীন্দ্রনাথের আন্দোলনে গানই দিয়েছে অপেক্ষাকৃত সহজ পথের সন্ধান।

রবীন্দ্রনাথের জীবন কেটেছে শিক্ষিতদের কাছে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ভূমিকা তৈরি করে দেবার কাজে। এখন তাঁর অবর্তমানে সেই শিক্ষিতমণ্ডলীরই দায়িত্ব উদ্যোগী হয়ে অশিক্ষিতদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাজ করা। জনগণ অযোগ্য, বিকৃতরুচি বা তাদের পরিবেশ কুৎসিত ব'লে তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যেতে যদি কোথাও দ্বিধা জাগে, সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজের বাণীই আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য। তিনি নিজেই নিজের সাধনার সত্যতা ও সার্থকতার পরীক্ষায় একটি গানে বলেছেন,

তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত,
যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।
কোলাহলের বেগে
ঘূর্ণি ওঠে জেগে,
নিযো তুমি আমাব বীণার সেইখানে পরীক্ষা।

জনগণ ও রবীন্দ্র-সংগীত

প্রাচীন কাল থেকেই সংগীতের যোগ সমাজজীবনে অপরিহার্য। আমাদের আদি সংস্কৃতির উৎস বেদশাস্ত্র গান হিসেবে গাওয়া হত। আদি কাব্য রামায়ণকথার প্রচার গানে। খ্রীষ্টান ধর্মগাথাও গান হিসেবেই প্রসিদ্ধ। মুসলমানদের আজান,—তাকে গান না বললেও গানের মতো বলতে বাধা আছে কি? 'গানাৎ পরতরং ন হি'—এ প্রাচীন বাক্য ছেড়ে দিয়ে সোজা কথায় এমনিতেই দেখা যায়, ভালো একটা গান শুনলে মন বলে ওঠে—'কেয়াবাৎ'! —এর কাছে আর কথা কী! প্রাচীন সংস্কৃত-কবি সংগীত ও সাহিত্যকে ভারতীমাতার দুই স্তনরূপে কল্পনা করেছেন, যা জীবন দেয়, সাহিত্যের পাশাপাশি সংগীত ভারতের দৃষ্টিতে সেই জিনিস।

কিন্তু সুরের প্রভাব ভাবাবেগের উপরই বেশি বলে গান হয়ে পড়েছে অনুভবেরই জিনিস; বুদ্ধি বা মননের কোঠায় আনাগোনা তার তত নয়, কেনাবেচার জিনিস ঝাল-মশলা-তেল-নুনের সামিলও নয় তার ব্যবহার, দৈনন্দিন জীবনের বস্তু ও ঘটনাসংঘাতের মধ্যে বেশিক্ষণ এর প্রত্যক্ষ প্রভাবকে ধরে রাখা যায় না। ঝড়বৃষ্টির আকাশে রামধনুর

মতো দেখা দিয়েই এ মিলিয়ে যায়। সেটুকুতেই হৃদয়-মন যায় রাঙিয়ে, এক পলকে স্নিগ্ধ হয়ে সব ভরে ওঠে।—গান কেজো সংসারে অকাজের জিনিস হলেও সমস্ত কাজ তার ঐখানে—ঐ সমস্ত-ঝামেলা-ভুলিয়ে-দেওয়া মন-ডোবানো একটি ঝিলিমিলি আবেশ ধরানোতে।

লোকসংগীতে কথার আশ্রয় নিয়ে গান কেজো সংসারের অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছে। বিশেষ করে, জনসাধারণের ক্ষেত্রে গানের কার্যকরিতা আঙ্গিক উৎকর্ষে বা তার লীলা-বৈচিত্র্যপ্রসারে তত নয় যতটা ভাব বহনে। এই ভাব বহনসূত্রেই দেশে লোকধর্মের বাহন হয়েছে গান; সেই সঙ্গে প্রেম, ভক্তি ও ঋতুর বিকাশে চিত্ত-আবেগ খেলেছে লোকের গানে। জাতীয়তা বা স্বদেশপ্রেম তো গানের মধ্য দিয়েই লোককে পাগল করে তোলে। ঘুরে ফিরে গান চলেছে লোকের ঘরকন্নায়, চলেছে তার ব্যক্তিজীবনেরও ফাঁকে ফাঁকে। মার্গ-সংগীতের মতো একটি বিশেষ সময়ের বৈঠকে তার জাদুসৃষ্টির দুর্লভতা নয়; সে সময়ে-অসময়ে লোকের সঙ্গী, পরম বান্ধব; উৎসবে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে, শ্মশানে—কোথায় না তার অবাধ গতি! সুরৈশ্বর্যের দিকটা একটু একটু নিরাভরণ বটে, কথার মাধুর্যে কিন্তু সে মন মজায়। তার ভাবের সরল হৃদ্যতাই যেন একটা অধরা সুর। একটা বিশেষ ধুয়া বা আখরের এক টানেই তার নিগূঢ় ব্যঞ্জনা মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজাতে থাকে কোন অনাহত সুরলহরী। বাঁধা সুর ছাড়াও সে যেন আরেক রকম সুরেরই নামান্তর। তার সুর সা-রে-গা-মার শব্দসুর নয়, ভাবের সুর; সবটা তার স্বরসংগতিতে নয়, অনেকটাই তার বেদনা-মূর্ছনায়। তবে তার মধ্যেও যে জাত-সংগীতের অর্থাৎ রাগরাগিণী তালমানের বনেদী ধারার ওস্তাদি কিছু প্রকাশ না পেয়েছে এমন নয়, বেশ কিছুই পেয়েছে—বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনে।

বাংলাদেশ গানের দেশ। এ দেশে সবকিছুতেই গান। জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষা, ধর্ম, কাব্য লোকব্যবহারের ক্ষেত্রে এসে সুরের ছোঁয়ায় প্রাণবন্ত

হয়ে সবই লোকের মন ছুঁয়ে আছে। রামায়ণ গান, চণ্ডীমঙ্গল গান মালসি গান, ঢপ গান, কীর্তন গান, গম্ভীরা গান, বাদিয়ার গান গাজির গান, কবি গান, তরজা, ঝুমুর, পাঁচালি, আখরাই, হাফআখরাই —সব গান; ভাসান গান, ভাদু গান, লেটু গান, ভাট গান, জাগ গান কালীকীর্তন, বারমাস্যা, আউল বাউল, ভাটিয়ালি, কত গান; সব-কিছুর মধ্য দিয়ে দেবতা-মানুষ-পশু-পাখি-গাছ-পালা সব এক হয়ে গেছে,—চলেছে একটি প্রাণের ধারা। গাথা আর গান তো প্রায়ই চলেছে এখানে পাশাপাশি। বাংলাদেশের এই বৈশিষ্ট্য। হিন্দী কাব্যেরও আবৃত্তি মাত্রেই দেখা যায় তাতে সুর লেগে আছে।

বাংলাদেশের সুরের স্বভাবেও একটু বৈশিষ্ট্য আছে,—রয়েছে সে মানুষকে ঘিরে। মানুষ ছেড়ে তা শুধু দেবতার স্বর্গে ফেরেনি। বরং দেবতার রাজ্যই সুরের টানে বাংলার ঐ মেটে ঘরের দাওযায় উঠানে যখন-তখন দেখা দিয়েছে। দেবতারা সেখানে মানুষ। অতি সামান্য মানুষও সেই মানুষের গানই মানুষদেবতাকে শোনায়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, জমিদার, মহাজন, হিন্দু-মুসলমান সব শ্রেণী থেকেই সমাজের যত সব শিরোমণি সজ্জন, এঁরা তো দেশে-গাঁয়ে দেবতারই সামিল,—সবাই এঁরা এক আসরে বসে প্রেমে ভক্তিতে বিগলিত হয়ে রাম, রহিম, শিবদুর্গা, মনসা, চণ্ডী, রাধাকানু, গাজি, ইত্যাদির কথা,—কবি, কথকতা, কীর্তন, পাঁচালি, 'পুঁথি' ইত্যাদি উপলক্ষ্য করে শুনেছেন এবং কর্তাব্যক্তিরা পর্যন্ত গেয়েছেন নিতান্ত গ্রাম্য পাড়াপড়শিদের সঙ্গে বসে। আর-যেখানে যত গলদ থাক, একমাত্র গানেই তারা জাত ভুলেছে। একালের রবীন্দ্রনাথ যতই ধনী, যত জ্ঞানী গুণী বিশ্বকবি হয়ে যতই উচ্চ হোন, তাঁরও আভিজাত্য খসে পড়েছে এই গানেই। এমন করে কোথাও তিনি ধুলো-মাটিতে এগিয়ে আসেননি গানই তাঁকে বলিয়েছে—

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
* * *
তোমারি ধ্লোমাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি;
* * *
আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষি॥

এই রাখালচাষির দিশি স্রেই তাঁর প্রাণের এ কথা বলা। এখানে স্পষ্ট প্রকাশ—শিল্পী নয় শ্ধ্, মান্ষ গেয়েছে মান্ষের গান। রবীন্দ্রনাথ মান্ষের গানই বেশি গেয়েছেন, এইজন্যই তাঁর গান লোকসংগীত। তবে তাঁর সে লোক, বেশির ভাগই শিক্ষিত, নিতান্ত রাখালচাষি তারা নয়, এ কথা সত্যি। কিন্তু তাঁর গান রাখালচাষির মধ্যে চলতে পারে কি না দেখতে দোষ কী? এ প্রশ্ন আগে ওঠেনি। কালের আবর্তনে এখন উঠল। এখন যে রাখালচাষিরাও 'মান্ষ' হতে চায়। এমন সম্পদ কি মান্ষের ধরা-ছোঁয়ার নাগালে আসবে না? বাংলাদেশে যেমন হাটেমাঠে গানের ছড়াছড়ি, এখানকার আবহাওয়াই যেমন গানে ভরা, একবার কোনোক্রমে লোকের কানে রবীন্দ্রসংগীতের স্র একটু ছ্ঁইয়ে দিতে পারলেই হল, বাংলার নদীর মতো সে ধীরে ধীরে দেশের মনে আপন পথ করে নেবে। স্রের উচ্চনীচতা, আর্থিক বাধা, সামাজিক পরিবেশ, দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা, র্চি-বৈষম্য, ধর্মান্ধতা, সময়-স্বিধার অভাব, বাঙালীর স্বাভাবিক গানপ্রবণতার কাছে সমস্তই তখন হয়ে পড়বে গৌণ। বাঙালী যে 'গানে-পাওয়া' জাত, তার রাখালচাষিও যে 'গানে-পাওয়া'।

বৈষ্ণব-কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একদিন লিখেছিলেন—

> বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
> চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
> বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
> অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
> লইতেছে আপনার প্রিয়-গৃহতরে
> যথাসাধ্য যে যাহার—

আজ রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধেও সে কথাই মনে হয়। আবির্ভাবের সময়ে কবি যেমন দেখেছেন দেশে বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব, বলা চলে যে, তিরোভাবের সময়ে শিক্ষিতমহলে তিনি তারো বেশি প্রভাব রেখে গেছেন আপন সংগীতের। রবীন্দ্র-সংগীত সত্যই মর্ত্যে স্বর্গ সৃষ্টি করেছে। সুরের বিশিষ্ট আবেদন রসিকের মনে পার্থিব অন্য সব কিছুকেই অবান্তর করে দেয়। কিন্তু দেশে স্বর্গমর্ত্যের তফাত বাধিয়েছে ওঁর কথায়। যারা অর্থ জানে তারাই গানগুলিকে উপভোগ করে বেশি আর সেই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারে তারাই ওর চর্চাকে নিয়েছে 'জন্ম-স্বত্ব' করে। ওর প্রভাব আজ শুধু শিক্ষিত মহলেই সীমাবদ্ধ—জনসাধারণ, অর্থাৎ চাষাভূষা প্রভৃতির কাছে রবীন্দ্র-সংগীত হয়ে আছে আজও বৈষ্ণব কবিতারই মতো সুদুর্লভ, দেবভোগ্য—মর্ত্যবাসীব কাছে, কবির ভাষায়, স্বর্গের 'সুধাস্রোত'। অভিজাত, বিদগ্ধ এবং অর্থবান—সমাজের এই একটা বিশেষ শ্রেণীরই তা ব্যবহার্য. তার ধারায় স্নান. কেলি ও পানের অধিকার শুধু বড়োদেরই —আধুনিক মর্ত্যলোকেও সেই যারা দেবতারই সামিল। কিন্তু—'এ কি শুধু দেবতার?'

স্বতই মনে হয়, ছোটলোকেরা মানে জানে না, ওরা এ-গানের বুঝবে

কী? রচনার যে চারুশিল্প, ভাষার যে মাধুর্য, ছন্দের যে নৃত্যগতি, ভাবের যে মহত্ত্ব, চমৎকারিত্ব—এ শিক্ষিত মহলেরই অধিগম্য; গানগুলির পরিবেশ ও অনুভবও সেই মহলেরই তো জিনিস; স্বয়ং স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিই যে সেই মহলের।

তাহলেও রবীন্দ্রনাথের গানের রস স্থায়ী। তাতে মানুষের শাশ্বত স্নেহ-প্রেম ইত্যাদি চিত্তবৃত্তিরই সুষ্ঠু বিকাশ রয়েছে, সুখ-দুঃখময় মানবজীবনের গভীরতম বেদনাই প্রতিধ্বনিত এর পংক্তিতে পংক্তিতে; সুরের প্রতি কম্পনে তার কান্নাহাসির যে দোলা, সে দোলা এই মানুষেরই চিত্তের।

শুনি সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা;—

মহাকবির লেখনীতে সমাজের উচ্চশ্রেণীর কথা বিচিত্র ভাষাভঙ্গীতে বেশি করে প্রকাশ পেলেও মূলত তা যে মানুষেরই মনের কথা। তাই সব মানুষের কাছেই তার আবেদন কিছু না কিছু সর্বস্তরেই পৌঁছবে। এই সার্বজনীনতাই উদার সৃষ্টির মহৎ গুণ। কবির কাব্যের চেয়ে কবির গানের সুরে এই আবেদন আরো বেশি। আঙ্গিকের বাধা অবশ্য উচ্চকলার ক্ষেত্রে সর্বত্রই জনগণের পক্ষে দুরূহ, কিন্তু এক্ষেত্রে আঙ্গিক জন-সংস্কৃতির প্রতিকূল নয় বলেই এ অপেক্ষাকৃত সুগম। জনসাধারণকে জাতীয় মহাকবির সহস্রদ্বার কীর্তিসৌধের অন্তর্নিহিত অতুল আনন্দবৈভবের কোনো দিক দিয়ে উত্তরাধিকারের অংশ দিতে হলে এই গানের দিকটাই বরঞ্চ তার অনুকূল ক্ষেত্র। ভাষা ছাড়াও পাখির গান যদি মানুষের প্রাণে লাগে, মানুষের গান মানুষের প্রাণে সাড়া জাগাবে না কি? গল্পগুচ্ছের

'শুভা'র কথা মনে পড়ে। বোবা গোরুগুলির সঙ্গে নীরব ভাষার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলত বোবা মেয়েটির। বেদনার আবেদন কোথাও ভাষামাধ্যমের অপেক্ষা রাখে না, সোজাই গিয়ে প্রাণে লাগে। মূক জনসাধারণও কী বুঝেছে তাদের সেই বোঝাটাকে ভাষায় পরিষ্কার না বোঝাতে পারুক, তাদের মতো করে একরকম তারা বুঝে নেবেই গানের অন্তর্নিহিত হাসিকান্নার রস, তাই থেকে সেই 'ধরার সঙ্গিনীটি'র মতো—

> ওই গানে যদি বা সে পায় নিজ ভাষা,
> যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি,—
> তোমার কি তার, বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি।

কাউকে চিরকাল গণ্ডি বেঁধে অশিক্ষিতত্বে অচল রাখা যায় না। মানুষ মানুষকে 'জাতে ঠেলে', আবার মানুষেরই মহৎ কৃতিত্ব 'জাতে ওঠায়' মানুষকে। রবীন্দ্র-পূর্বের শিক্ষিতসমাজই কি সংস্কৃতিতে রবীন্দ্র-পরবর্তী সমাজের স্বগোত্র? এই শিক্ষিতেরাই তো আপেক্ষিক-ভাবে একদিন অশিক্ষিত ছিলেন আবার, 'সেকালের রুচির' শিক্ষিতেরা আজকের শিক্ষিতসমাজে জাতে-ঠেলা। বস্তুত অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য দিয়ে দুই স্তরে তফাত অনেকখানি। রসবোধে এই ব্যবধানের আপেক্ষিক কৌলীন্য অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। শিক্ষিত-মহলকে মনঃক্ষেত্রে ঢেলে সেজে তিনিই একে জাত থেকে তুলেছেন আভিজাত্যের বৈকুণ্ঠলোকে।

বৈকুণ্ঠ 'বৈকুণ্ঠই' থাকুক, বৈষ্ণবগানও বৈষ্ণবগানই থাকুক, দেবতারা দেবতা থেকেই সে স্বর্গীয় গান উপভোগ করুন, কিন্তু অতিবেদনায় যেমন কবির মনের এককোণে একদিন এই প্রশ্ন আঁকুপাকু করেছিল, তেমনি আজো তাই করে—শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?

রবীন্দ্রনাথের রচিত নব বৈকুণ্ঠলোকের দ্বারে রবীন্দ্রনাথের বেদনার সুরস্মৃতিটুকুর রেশমাত্র ধরে সেই জিজ্ঞাসাই আজ প্রতিধ্বনিত—রবীন্দ্রনাথের গানও কি কেবলি শুধু বড়োদের বৈকুণ্ঠ বনাম বৈঠক-খানার গান? আপেক্ষিকভাবে দেশের অলিতে-গলিতে যে জনসাধারণ মর্ত্যবাসী আছে—

> এ সংগীতরসধারা নহে মিটাবার
> দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের
> প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
> তপ্ত প্রেমতৃষা?

ওরা যদি হীনরুচি, হীনবৃত্তির জন্য নিম্নগামী হয়ে থাকে, এই সংগীত তাদের মধ্যে মহৎ আদর্শ, সৌন্দর্য ও শালীনতার উন্নত বোধ জাগিয়ে তাদের গোটা শ্রেণীজীবনকেই সুসংস্কৃত করে তুলতে পারে। ভালো জিনিস পেলে মন্দ জিনিসে রুচি ক্রমে আপনি হবে মন্দীভূত। কিন্তু তাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বঞ্চিত করলে, তাদের ঘৃণা অপমানে দূরে ঠেলে রাখলে—

> 'অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

কবিরই সতর্ক বাণী—

> যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে,
> পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
> অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
> তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥
সবারে না যদি ডাক, এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যু-মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥

এদের রুচির উন্নতির সঙ্গেই জাতির সংস্কৃতিমান সমুন্নত হবে। কিছু আগেই দেখা গেছে, সাধারণ লোকের মধ্যে সংগীতের প্রচলন কথার সূত্রেই বেশি। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের কথা তাদের কাছে সহজবোধ্য নয়। এই দাঁড়াচ্ছে বাধা। সে-বাধা একটু দুরূহ হতে পারে, কিন্তু তা অলঙ্ঘ্য কি? ভাববার তেমন কী আছে! কারণ, রবীন্দ্র-সংগীতের যেমন কথা রয়েছে, তেমনি সুরও তো আছে! দুইই যে তার সমপ্রধান। সুরের সঙ্গে সুসংগত ভাববাহী কথার সমআংশিকতা দিয়ে সে লোকসংগীতধর্মী, কিন্তু একান্তভাবে তার সুরেরই কি কোনো স্বতন্ত্র আবেদনের দান নেই? সাধারণ লোকে রবীন্দ্রনাথের কথা যদি না-ই বোঝে, আনন্দ একটু কম পাবে আদর করতে একটু সময় নেবে, এই মাত্র, কিন্তু তা বলেই লোকে যে এ-গান নেবে না, তাদের মধ্যে এ জিনিস চলবে না, তা কি হতে পারে! গানের ক্ষেত্রে কথার বাধা বড়ো নয়, কেননা গানে কথাই বড়ো বা একমাত্র জিনিস নয়।

সুর দিয়েই প্রধানত সংগীতের সার্থকতা বিচার্য। কথা তো সাহিত্যের এলাকার জিনিস। আমরা হিন্দী গান গাই, শুনি, কথায় উদাসীন থেকে। সুরের আবেদনেই থাকে আমাদের লক্ষ্য। নিছক সুরেই মনোহরণ করে বলে হিন্দী গানকে শাস্ত্রীয় গান বা মার্গ-সংগীত বলি। রবীন্দ্র-সংগীতে কথার কাজ অবশ্য সুর-ঘেঁষা এবং অনেক-খানি, কিন্তু, রবীন্দ্র-সংগীতও কথা-নিরপেক্ষ শুধু সুরের টানে কোথাও ভালো লাগে কি না, অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকলার ক্ষেত্রে তার

সার্থকতার সম্ভাবনা কতদূর, সেই সত্য প্রমাণের ক্ষেত্র এক হচ্ছে কথা-উদাসীন অ-বাঙালীমণ্ডল, আর হচ্ছে এই রবীন্দ্র-কথায় অনভিজ্ঞ বাঙালী জনসাধারণ।

রবীন্দ্রনাথের সুরগুলি জনগণের হৃদয় স্পর্শ করে কি না, তার পরীক্ষা হয়নি, কিন্তু যেটুকু হয়েছে তা আশাপ্রদই বলতে হবে; তবে পরীক্ষার যেটুকু সুযোগ মিলেছে সে সিনেমায়—ব্যবসাদারির পরিবেশে, এটা জাতির পক্ষে কলঙ্কজনক হলেও সত্য। সিনেমায় দেখা যায়, রবীন্দ্র-সংগীতের সমাদর দিনে দিনেই বেড়ে চলেছে। থাক না তার পিছনে নাটকীয় সংস্থান-কৌশলের সহায়তা, কিন্তু এও সত্য যে, যা লোকে শুনছে, তা ভালো লেগেছে বলেই তারা পথে-ঘাটে তা গেয়ে চলেছে, যদিও সুর তাদের হয়তো সর্বাঙ্গশুদ্ধ নয়। এই সময়ে বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র খুলে, যদি তাদের শুদ্ধ সুর শেখাবার সুযোগ দেওয়া হতো, তবে আরো ভালো ভাবে গেয়ে সুরের সৌন্দর্যে তারা আরো আনন্দ নিজেরা পেত, বিলাতেও পারত তা পরকে। এ ভাবেই কীর্তন, বাউল এবং অন্যান্য জাতীয় সংগীত-শাখার মতো রবীন্দ্র-সংগীতও হয়ে পড়ত দেশবাসীর জাতীয় জিনিস। ঘরে ঘরে এ-ভাবে না ছড়ালে, অর্থাৎ জাতির প্রাণে প্রাণ গেঁথে না গেলে সুদূর দেশ-কালের পরিধিকে পেরিয়ে সর্বযুগ-জয়ী মহিমায় এ-সংগীত অমর হতে পারবে কি? যতই ভালো জিনিস হোক, টিঁকে থাকতে হলে জাতির অন্তরের সঙ্গে যোগ চাই।

অন্তিম দশায় জোর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। আরো বলেছেন—জাতিকে তাঁর গান গাইতে হবে, গাইতে হবে ঘরে ঘরে। বলে গেছেন, যদি কোনো রচনা নিয়ে আমি অমরত্বের অহংকার করতে পারি, সে আমার এই সংগীত। এই সংগীতই আমি রেখে গেলেম পূর্ণ বিশ্বাসে; রইল এ বিয়েতে, শ্রাদ্ধেতে, সুখে-দুঃখে ঘরকন্নার তুচ্ছাতিতুচ্ছ নানা অনুষ্ঠানে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল

অবস্থার সকল রকম হর্ষ-বেদনাই আমি ধরে ধরে গেঁথে দিয়ে গেলেম এই গানে। জাতি বাঁচলে তাকে গাইতে হবে আমার গান। প্রাণের মধ্যে তিনি জাতির প্রাণ অনুভব করেছিলেন, প্রাণ দিয়েই গানে গানে সে প্রাণ ফুটিয়েছেন; তাই তাঁর গান যে জাতির প্রাণের গান হতে পারে বা হবেই, এমন সত্য শুনিয়ে যেতে তাঁর দ্বিধা হয়নি। আশা করি, তাঁর সেই কথাকে মূল্য দেবেন তাঁরাই যাঁরা তাঁর অনুরাগী, দেবেন জাতির যাঁরা ব্যবস্থাপক,—দেবেন সমগ্র জাতির যাঁরা প্রধান অংশ—সেই জনগণ। তবে জনগণের কাছ থেকে সমূহ কিছু আশা করা বৃথা, তাঁরা এর মূল্য এখনই কিছু বুঝবেন না। তাঁদের বুঝিয়ে নিতে হবে। কবির গানকে জনগণের গান করবার ব্যবস্থা করতেই হবে। সেই হবে তাঁর স্মৃতির একটি অন্যতম যথার্থ পূজা। আজ জনজাগরণের যুগে জনকর্মীদের এবং স্মৃতিরক্ষার দিনে দেশব্যাপী কর্মরত বিরাট অনুষ্ঠানের এ বিষয়টির ব্যবস্থায় তৎপর হবার দায়িত্ব আছে। এদিক দিয়ে বিশেষ করে রবীন্দ্রস্মৃতিরক্ষা-কমিটির কার্যসূচীতে এ-বিষয়টির বিশিষ্ট স্থান পাবার কথা।

রবীন্দ্র-সংগীতকে লোকের মধ্যে চালু করতে হলে, নানা উৎসব, অনুষ্ঠান, নানা উপলক্ষ্য বুঝে বুঝে এবং প্রচলিত ছাড়াও নূতন করে সে-সব উৎসবাদি আরো সৃষ্টি করে নিয়ে,—ধরিয়ে দিতে হবে রবীন্দ্রনাথের গান। তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে লোকের ঘরে ঘরে, সুখে এবং বেশি করে দুঃখের মুহূর্তগুলি বেছে বেছে, সান্ত্বনার স্নিগ্ধ-স্পর্শে এই গান সামান্য একটু অর্থ বুঝিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে তাদের কানে, তবেই ঘর করে নেবে সে প্রাণে। সব না হোক, অনেক গান আছে. কাছে নিয়ে গেলে লোকে বুঝবে এখনই,—বুঝবে সুরে, বুঝবে কথায়ও; সেইগুলি দিয়ে শুরু করেই পাঠের ক্রম ও গতি বাড়াতে হবে।

কিন্তু তাচ্ছিল্য করে বাঁ হাতের ক্ষুদকুঁড়ার দান নয়—ব্যবস্থা করতে

হবে ভালো গানগুলি সবই ভালো করে ছড়াবার। চিরকাল শুধু কয়েকটি জাতীয় সংগীত বা কীর্তন বাউল ঢঙের সহজে জন-আবেদনমূলক গান নয়, সুরৈশ্বর্যের মণিকোঠার সন্ধান দিতে হবে তাদের মধ্যে বেছে বেছে সুকণ্ঠ গুণীদের; সেখানে জাতি দেখে পাঁতি নয়, কাঞ্চন বা বিদ্যাকৌলীন্যের বাছবিচার নয়। গানের ক্ষেত্রে জাতি হচ্ছে সুর আর বে-সুরের। সুরে যাঁর অধিকার আছে, তাঁরই সহজ অধিকার থাকবে ভালো গানে। ছোট-বড় ধনী-দীন পুরুষ-নারী সকল জাতির সকলে এক-একটি সংঘে মিলে গানের নিয়মিত চর্চা করলে দেশ জুড়ে হবে একটি বিরাট আনন্দ-নিকেতনের সৃষ্টি; রবীন্দ্রসংস্কৃতির দুই ধারা—'শান্তিনিকেতন' ও 'শ্রীনিকেতনে'র মতো এই 'আনন্দ-নিকেতনে'র আর-একটি ধারাতে বয়ে যাবে কবির আর একটি রসগঙ্গা; সে-আনন্দে সমগ্র জাতি প্রাণ পাবে।

এই সংগীতের ধারাটিকে কেবল বিশেষ একটি শ্রেণীর আওতায়, দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত পুষ্করিণীর মধ্যে ধরে রাখলে একদিন তা শুকিয়ে ধারাটি লোপ পাবার বা অচলতায় দূষিত হবার শঙ্কা আছে। জনচিত্তের চিরবহমান সমুদ্রবক্ষে একে মুক্তি দিতে হবে। পুকুর-গুলিও থাকবে, কিন্তু সমুদ্রের যোগে তলায় তলায় তার ধারাবেগ অব্যাহত থেকে সেগুলি থাকবে এক নির্মল এবং অক্ষয় জীবনরসে সঞ্জীবিত, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালীর শিক্ষিতসমাজ যেমন সঞ্জীবিত থেকে আসছে কীর্তনগানে।

কিন্তু সুরৈশ্বর্যে, বিষয় বা বেদনা-বৈচিত্র্যে, সর্বোপরি বিশ্বসাহিত্যমূল্যে রবীন্দ্র-সংগীত কীর্তন বাউলের চেয়ে বেশি দিন ধরে বেশি লোকের মধ্যে বেঁচে থাকবার সম্ভাবনায় পূর্ণ—অবশ্য যদি তা সংগঠিত প্রচেষ্টায় অনুশীলিত ও প্রচারিত হয়ে চলে। কীর্তনের পিছনে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধ বিপুল জনসংগঠনক্রিয়া লক্ষ্য করবার বিষয়। তেমনিভাবে সুসম্বদ্ধ প্রচেষ্টায় অগ্রসর হয়ে অশিক্ষিত বা

স্বল্পাশিক্ষিত মহলের কেন্দ্রে কেন্দ্রে রবীন্দ্র-সংগীতের সুর শোনালে তারা আকৃষ্ট হবেই. তারপরে কথার অর্থ কিছু কিছু বুঝিয়ে দিলে তারাও কিছু কিছু করে তা না বুঝতে পারবে এমন নয়। কারণ কীর্তন বাউলেরও এমন অনেক গান আছে ভাবগূঢ়তায় যা শিক্ষিতদেরও অনধিগম্য। কিন্তু এ দেশের নিরক্ষর চাষারা সেগুলি উপভোগ করে তার নিগূঢ় অর্থেই।

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথাও এই যে,—অবিকৃত সত্য ছড়িয়ে দেওয়া চাই সমাজের সর্বস্তরে। যে যার অধিকারমতো তাকে আয়ত্ত করবে নিজস্বমতে। তিনি নিজের জীবনেও গ্যেটে, শেকস্‌পীয়র প্রমুখের কাব্য বা দুরূহ দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি ছোটবেলা থেকে পড়ে গেছেন নির্বিচারে, কেউ তাঁকে বাধা দেয়নি, তিনিও অন্তরের দ্বিধায় ঠেকে যাননি। যে বয়সে যার থেকে যতটা নেবার বুঝে বুঝে নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। লোকশিক্ষাক্ষেত্রেও তাই অভিমত জানিয়েছেন এ-পদ্ধতির অনুকূলে। শিক্ষিতেরা গানের মানে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে মনের অনেকটা কাছে এসে দাঁড়াবে অশিক্ষিতদের। ক্রমে মানে বুঝে যে উপরি আনন্দ পাবে, তার প্রতিদানে জাগবে জ্ঞানদাতার প্রতি শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা। অশিক্ষিতদের কাছ থেকে এই কৃতজ্ঞতা ছাড়াও মাঝে মাঝে আচমকা দেখা যাবে শিক্ষিতেরা উপহার পেয়েছেন এক-একটি সুকণ্ঠের সুরের আনন্দ। বৈষয়িক কাজের প্রয়োজনে যে-ই যে-স্তরে থেকে যত কিছু উচ্চনীচ মান-অপমানের ভূমিকায় চলাফেরা করুক—বড়বাবু-বেহারা, মনিব-প্রজা, খাতক-মহাজন, সম্বন্ধ যতই বিকৃত হোক না কেন, শুধু বিষয়-স্বার্থবিরহিত এই একটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে সংগীত-আনন্দে মেতে সকলেই সকল আড়াল অজানিতে কখন ঘুচিয়ে দিয়ে এক হয়ে বসেছে একাসনে। বাঙলার ধারাই এই। পূর্বেও যে গানের আসরেই জাত-ভোলা মানুষ উচ্চনীচ সকলে মিলেছে,—প্রসঙ্গটির গোড়াতে সে-চিত্র

পাওয়া যাবে। নূতন যুগে নূতন বুচির উচ্চনীচ আবার তেমনি করেই নূতন কবির গানে মিলবে, এ শুধু স্বপ্ন নয়। দিনের শেষে রাত্রির পরিবেশে ঘুমের মতোই এই গীতি-আসরের আনন্দ-আবেশের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিমনকে, সেই সঙ্গে ক্রমে সমাজকেও, করে চলবে দিনের পর দিন নূতন প্রাতের শিশির-ধোয়া নূতন-ফোটা ফুলগুলির মতো টাটকা, স্নিগ্ধ, সুনির্মল।

এই ভাবে তার জড়তা ঘুচিয়ে, দুশ্চিন্তা, দুষ্প্রবৃত্তি ঘুচিয়ে, অনেক দুর্গতি থেকে সমাজকে মুক্তি দেবে। সমাজের উচ্চনীচের মধ্যে ব্যবহারিক সম্বন্ধে ব্যবধান থাকলেও আত্মিক সম্বন্ধে সম্প্রীতির ফল্গু-যোগ চলবে এই সংগীত-সংস্কৃতির সূত্রে। সামাজিক স্বাস্থ্যোন্নতিতে তার প্রভাব হবে অভূতপূর্ব ফলপ্রদ। বক্তৃতা নয়, সংঘর্ষ নয়, দেশহিতের কোনো গালভরা নামের জাঁকাল উদ্দেশ্য নয়, নয় কোনো বাদ বা প্রতিবাদ,—দেখা যাবে শুধু নিছক একটা আনন্দ ও প্রীতির উপলক্ষ্য নিয়ে এই রবীন্দ্র-সংগীত-চর্চা থেকেই তলে তলে সর্বসাধারণের মিলনক্ষেত্র রচনা দ্বারা জাতীয় প্রগতির একটা মহান কাজ কত সহজে সিদ্ধ হয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় জাগরণের দিনে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক যোগকেই মুখ্য সূত্র বলে মেনে নিয়েছেন। জাতীয় জাগরণের একটি সহজ ও কার্যকরী পন্থা হিসেবে রবীন্দ্র-সংগীতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার চেষ্টায় প্রত্যেক দেশহিতৈষীরই অগ্রসর হওয়া উচিত।

সমাজ আজ নানাভাবে বিচ্ছিন্ন। ধর্ম আজ মানুষকে সুন্দরের পথে শিবের পথে টানতে পারছে না, সমাজ-বন্ধন মানুষকে তৃপ্তি দিচ্ছে না। ধনী-দরিদ্রে ভেদ, উচ্চবর্ণে-নীচবর্ণে ভেদ, ধনিকে-শ্রমিকে ভেদ, হিন্দু-মুসলমানে ভেদ, ভেদের আর অন্ত নেই। কিন্তু এই সব অচল ভেদ-বিভেদকে সহসা দূর করতে পারে, এমন শক্তি কই? অনেক চেষ্টা হচ্ছে বটে, অনেক শক্তি কাজও করছে, কিন্তু এ ভেদ যেন

জগদ্দল পাথরের মতোই অনড়। এই ভেদকে সাময়িক বলে তুচ্ছ করে দেখলে চলবে না,—মানুষের স্বভাবের একটা বাস্তব প্রবণতা বলেই একে স্বীকার করে নিয়ে নূতন কোনো পথে সকলের মিলনভূমির সন্ধান করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, রবীন্দ্রনাথ যে গান বাঙালীর কণ্ঠে উপহার দিয়ে গেছেন, তা জাতির এই নূতন মিলনপথে কাজে লাগতে পারে। তার সুরের মালা-ই সকলকে ভিন্ন রেখেও একজায়গায় এক করে মেলাতে পারে। সেজন্য ধর্ম, জাতি ও শ্রেণীনির্বিশেষে সকলকেই এই মিলনভূমি রচনায় যোগ দিতে হবে। রবীন্দ্র-সংগীতকে জনগণের মধ্যে প্রচার করা মানুষে-মানুষে মিলন-পরীক্ষারই কাজ।

গানের ভিতর দিয়ে জাতীয় জাগরণের এক মহান রূপ কবির চোখে একদিন সবিস্ময় সম্ভ্রম জাগিয়েছিল তাঁর বিদেশ ভ্রমণের সময়ে। তিনি ইতালিতে গিয়ে একবার হাজার হাজার লোকের একটি সমবেত সংগীতানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেটি কোনো প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাঞ্জলির উপলক্ষ্য হয়ে থাকবে। সেই সহস্র কণ্ঠের ও যন্ত্রের সমবেত সংগীত শুনে অবধি আমৃত্যু তাঁর মনে গাঁথা ছিল সেই দুরাকাঙ্ক্ষার ছবি—ভরসা করে আমাদের দেশে তা দেখে যাবার আশা জানাননি, কিন্তু প্রসঙ্গত মাঝে মাঝে সেই অলৌকিক ঘটনাস্মৃতির উল্লেখ করতেন। মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ত, "রেখে গেলেম, গাইতে হবে আমার গান ঘরে ঘরে।"

সমাজের ছোট ও বড়ো দুই স্তরে মিলন ঘটাবার মহাব্রতে রবীন্দ্র-সংগীতের উপযোগিতার কারণ দু'দিক থেকে দু'টি। এক হচ্ছে এ-সংগীত জাতীয় বনেদী সংগীত-ধারার ভিত্তিতে রচিত; এবং অন্যান্য শাখা-উপশাখার অর্থাৎ লৌকিক ধারার সংগীতকৌশলও আত্মগত করে জাতির সঙ্গে এ-সংগীতের একেবারে নাড়ীর যোগ। সর্বোপরি সুরে সুরে বর্ণবিন্যাসের জাদুসৃষ্টিতে রবীন্দ্র-সংগীত অত্যন্ত মনোহারী। জনগণ এর মধ্যে চিরন্তনকে পাবে বিচিত্র নূতনের

বেশে। তাই রবীন্দ্র-সংগীতের সুরের প্রতি তাদের আকর্ষণ এবং কৌতূহল অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষিতদের তো কথাই নেই, সুর ছাড়াও তাঁরা উন্নত ভাব এবং সাহিত্য-রসের জন্য এমনিতেই এর অনুরাগী। এর বিশুদ্ধ মানসিক অনুশীলন থেকে দুই স্তরের লোকই আনন্দ উপভোগের সুযোগ পাবে। তার কারণ রবীন্দ্র-সংগীত সুরে, ভাবে, ভাষায় গ্রাম্যতা বা ন্যাকামি ইত্যাদি সর্বপ্রকার আবিলতাবর্জিত। অন্য কোনো গানে ভাষায়, ভাবে জাতিবর্ণনির্বিশেষে মেশবার এমন উদার সর্বমানবিক বিষয়-নির্বাচন নেই। তার জন্যই এই গানের আসর জাতীয় মিলনসম্ভাবনায় মহীয়ান।

এ সম্পর্কে আর-একটি বিষয় ভাববার আছে। সব ব্যাপারেই আজকাল আর্থিক সমস্যাটাই সবচেয়ে বড়ো বাধা। আর্থিক লাভালাভ দিয়েই জিনিসের মূল্য বিচার আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে; এই নিদারুণ অন্নসমস্যার দিনে সেটা খুবই স্বাভাবিক। ক্রমশ এই রবীন্দ্র-সংগীতকেও যাতে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আর্থিক আয়ের ভিত্তিতে দাঁড় করানো যায়, নানাপথে সে চেষ্টাও অল্পবিস্তর করা দরকার। আনন্দ ও মিলনসৃষ্টির নিছক আদর্শবাদের সঙ্গে কোনো একদিকে এই আর্থিক ভিত্তির যোগ ঘটলে তখন সাধারণের মধ্যে এর স্থায়ী অগ্রগতি অনেকটা অবাধ হবে।

রবীন্দ্রকাব্যে লোকবাণী

"লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ, মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি, এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব্য সমগ্রভাবে আলোচনা করে দেখলে হয়তো তাঁরা দেখবেন, আমার প্রতি অবিচার করেছেন।"— "চিত্রা" কাব্যের সূচনায় কবি এই কথাটি বলে গেছেন। বিচার-অবিচার নয়, কবির এই উক্তির সূত্র ধরে তাঁর কাব্যধারা অনুসরণ করে দেখা যেতে পারে কোথায় কোথায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণী অর্থাৎ জনসাধারণের কথা। আর, তা দেখলে দেখা যাবে, অতি সত্য তাঁর উক্তি, মিথ্যাই লোকাপবাদ। যে বিচিত্র প্রেরণা কবির কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, প্রকৃতি ও প্রণয় সম্বন্ধীয় ভাবাবেগের মধ্যে সাধারণ-ভাবে মানবপ্রীতির আকারে তার আদি উন্মেষ, পরে ক্রমেই তা আরো বিশেষ পথ নিয়ে মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নসাধারণের ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়েছে।

"কড়ি ও কোমল"-এর প্রথম কবিতা 'প্রাণ'-এ কবি প্রথম বলেছেন,

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।" কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে তখন উগ্র ধর্মোন্মত্ততা দেখা দিয়েছিল, তাতে তাঁর মন গেল না, তিনি হট্টগোল এড়াবার জন্য শহর থেকে দূরে সবে গেলেন, সেখানে থেকে তাঁর নিজের মনের গান বেজে উঠল 'মঙ্গলগীতে'—

যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখশোক।
* * *
সমুদয় মানবের সৌন্দর্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর।

এই সময়টাতে কবি লেখা নিয়েই মেতে ছিলেন, কিন্তু তাতে অস্বস্তি জেগেছে—

নিষ্ফল হয়েছি আমি সংসারের কাজে
লোকমাঝে আঁখি তুলে পারি না চাহিতে।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।

অকেজো অপবাদের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার আশায় আবেদন জানাচ্ছেন—

মা কেহ কি আছ মোর, কাছে এসো তবে,
পাশে বসে স্নেহ করে জাগাও আমায়।
তবেই ঘুচিবে মোর জীবনের লাজ
যদি মা করিতে পারি কারো কোনো কাজ।

কবি অহংকারকে ধিক্কার দিয়ে বলছেন,—

গান গাহি বলে কেন অহংকার করা
শুধু গাহি বলে কেন কাঁদি না সরমে।
কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্বল,
মোরে তোমাদের মাঝে কর গো আহ্বান,
বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রু-জল,
দূর করি হীন গর্ব, শূন্য অভিমান।
তারপরে একসাথে এসো কাজ করি
কেবল বিলাপ গান দূরে পরিহরি॥

দেশের দশজনের সঙ্গে মিলতে গিয়ে দেখছেন, কাজের নাম নেই,— "শুধু হাসিখেলা প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা।" এই অবস্থায় বাঙালীর আত্মসম্বিৎ জাগাতে বলছেন,—

ওরে চেয়ে দেখ্ মুখ আপনার
ভেবে দেখ্ তোরা কারা।
আছে ইতিহাস আছে কুলমান
আছে মহত্ত্বের খনি।

এখানে কবি এমন একটি কাজের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন যা সত্যিই তাঁর জীবনে তিনি সার্থক করে গেছেন; অক্ষরে অক্ষরে এমন সত্য ভবিষ্যদ্বাণী বুঝি আর হয় না,—

বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে
কাঁদিছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।

জাতির জন্য তাঁর জীবনের সব কাজের বড় কাজই এই স্থান কিনে দেওয়া। এর পরে 'মানসী'র কবি প্রিয়া ও প্রকৃতির প্রেমে ডুবে গেছেন। এরই মধ্যে হঠাৎ "দুরন্ত আশা" জেগে উঠেছে তাঁর মনে, বাস্তবের দিকে চোখ পড়ে প্রাণহীন ক্ষুদ্রতার পরিস্থিতিতে তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন—

ভদ্র মোরা শান্ত বড়ো
পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নিচে
শান্তিতে শয়ান।

যারা

কাগজ নেড়ে উচ্চস্বরে
পোলিটিকাল তর্ক করে;

সেই দেশবাসীকে উদ্দেশ করে বলছেন,—

দাস্যসুখে হাস্যমুখ,
বিনীত জোড় কর
প্রভুর পদে সোহাগ মদে
দোদুল কলেবর।
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি
ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি
যেতেছ ফিরি ঘর,
ঘরেতে বসে গর্ব কর
পূর্ব পুরুষের
আর্যতেজ-দর্পভরে
পৃথ্বী থর থর।

সব দেখেশুনে বলছেন—

কোথাও যদি ছুটিতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে.
ভব্যতার গণ্ডি মাঝে
শান্তি নাহি মানি।

বাঙালীর ক্ষুদ্রতাকে ব্যঙ্গ করে ও ধিক্কার দিয়ে তিনি অনেক কথাই বলেছেন সত্যি, কিন্তু তারই সঙ্গে আবার জাগবার প্রেরণাও তাদের দিয়েছেন-

সবাই বড়ো হইলে তবে
স্বদেশ বড়ো হবে।

পরবর্তীকালে 'গীতাঞ্জলি''তে তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করে বলেছেন, নিচে যারা পড়ে আছে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে তাদেরও টেনে নিয়ে সবাই মিলে বড়ো না হলে ঐ নীচদের সঙ্গে উচ্চদের তথা সমগ্র জাতিরই পতন অবশ্যম্ভাবী। এই "সবাই'র মধ্যে অবশ্য এখানে দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সাধারণই রয়েছে বেশি—দরিদ্র, নিম্ন, অজ্ঞ সাধারণের কথা এসেছে আরো পরে। "সোনার তরী" এবং "চিত্রা"তে তার ক্ষীণ সূচনা। তখন তিনি নিয়েছেন "পদ্মার আতিথ্য", প্রজারা তাঁর আশে-পাশে। রচনাবলীর সূচনাংশে বলেছেন,—"এইখানে নির্জন-সজনের নিত্য সংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছেছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি। সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি

প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্ব-প্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।"
যা বড়োদের উপভোগ্য, ছোটোরা কি তার থেকে একেবারেই বঞ্চিত হয়ে থাকবে? তারা যদি তার থেকে কোনোদিক দিয়ে আনন্দ পায়, তাতে কার ক্ষতি? আর সে অধিকার দিতে দোষই বা কী? 'সোনার তরী'র 'বৈষ্ণব কবিতা'র মধ্যে মানবলোকের বঞ্চিত নিম্নদের জন্য কবির এই সমবেদনার আভাস প্রথম প্রকাশ পেয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে কবিতাটি দেবতা এবং মানবের সম্বন্ধে হলেও নিম্ন ও নিঃস্বদের প্রতিই তার ইঙ্গিত। এদিক থেকে অনুভূতির মূলসূত্র হিসেবে কবিতাটি আজকের দিনে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে হবে। এই বইয়ে নানা কথার মধ্যে 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় সুর উঠেছে,—

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব হৃদয়ে মিশিতে।

'গতি' কবিতায় বলেছেন,—

চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর
লক্ষ কোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।

'মুক্তি' কবিতায়—

বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি সমাধিতে?

"চিত্রা"তেই সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে লোকজীবনের বাণী উদ্গত হল

কবিকণ্ঠে। "এবার ফিরাও মোরে" হচ্ছে সেই বিখ্যাত কবিতা যাতে কবির এই বিশেষ দিগ্দর্শনের প্রথম প্রকাশ।—

> আগুন লেগেছে কোথা, কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
> জাগাতে জগৎ জনে? কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
> শূন্যতল? কোন অন্ধ কারা মাঝে জর্জর বন্ধনে
> অনাথিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান
> অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
> লক্ষ মুখ দিয়া; বেদনারে করিতেছে পরিহাস
> স্বার্থোদ্ধত অবিচার; সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
> লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
> মূক সবে—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
> বেদনার করুণ কাহিনী: স্কন্ধে যত চাপে ভার
> বহি চলে মন্দ গতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার
> তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
> নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
> মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
> শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনো মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
> রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
> সে-প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
> নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
> দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
> মরে সে নীরবে।—

এই সব মূঢ়. ম্লান, মূকদের প্রতি দৃষ্টি তাঁর এই প্রথম পড়ল বিশেষভাবে। এদের জন্য কিছু করতে না পারলে তাঁর মন স্বস্তি

পাচ্ছিল না। কবি তিনি, কাজ তাঁর গান করা। সেই গানে প্রাণ ঢেলে এদের দুঃখবেদনার কথা বলে এদের অনুপ্রাণিত করা এবং এদের প্রতি বিশ্ববাসীর প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তোলাকেই তিনি ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেন, বললেন--

কবি, তবে উঠে এসো--যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।

আগে থেকেই তিনি তৈরি হচ্ছিলেন, এখানে এসে আরো দৃঢ় প্রেরণা পেলেন তিনি জনগণের জীবনে. তাদের দুঃখকষ্টকে নিজের জীবনে অনুভব করা কর্তব্য বলে মনে করলেন, বললেন—"এবার ফিরাও মোরে. লয়ে যাও সংসারের তীরে. হে কল্পনে. রঙ্গময়ী!"

. .দুঃখ যদি পায় তার ভাষা
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি--তবে ধন্য হবে মোর গান.
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া ভালো। কবির ভিতরে বরাবর একই শক্তির বিপরীত দুটি ধাবা পাশাপাশি কাজ করেছে, একটি তাব বহির্মুখী, অন্যটি অন্তর্মুখী। 'চিত্রা'র সূচনায় তিনি বলেছেন.-- "বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু. অন্তরে যার প্রকাশ সে একা।" এই দুই প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কর্মজীবনের সেই বিচিত্রের ডাক পড়েছে। 'আবেদন' কবিতায় ঠিক তার উল্টো কথা। কবি বলছেন, "কর্মক্ষেত্রে যেখানে কার্যক্ষেত্রের জনতায় কর্মীরা কর্ম করছে সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান

সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।" জীবনের দুই ভিন্ন মহলে কবির এই ভিন্ন ভিন্ন কথা। জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী—কবির কাছে এ দুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য।

উল্লিখিত দুই মহলের মধ্যে একটির পরিচয় নিয়েই আমাদের কথা। এর অলিগলি কক্ষকক্ষান্তরে যাবার মুখে। এর পরে আসছে 'চৈতালী'র সীমা।

সেখানে প্রবেশ মুখেই দেখা দিচ্ছে—দেবতার মন্দির মাঝে নামজপে রত এক প্রবীণ ভক্ত। সন্ধ্যাবেলা বস্ত্রহীন এক জীর্ণ দীন ধূলিমাখা দেহে আশ্রয় চেয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতেই তাকে ভক্ত অপবিত্র ব'লে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে। চক্ষের নিমেষে ভিখারী দেবতার মূর্তি ধ'রে তাকে বলল,—

জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।

এর পরে আসে একটি 'সামান্য লোক'। আজ কবিদৃষ্টিতে তারও অসামান্যতা ধরা পড়েছে। তেমনি অসামান্য হয়ে দাঁড়াল এসে 'কর্ম' কবিতায় কবির নিজেরই প্রাতে-দেখা-না-পাওয়া সামান্য ভৃত্যটি। যখন তাকে দেখে কবি রোষভরে' দূর করে দিয়ে বললেন 'দেখতে চাইনে তোর মুখ"—সে বলল—

কালি রাত্রি দ্বিপ্রহরে
মারা গেছে মোর ছোটো মেয়ে।"
এত কহি ত্বরা করি গামোছাটি কাঁধে ধরি
নিত্য কাজে গেল সে একাকী
প্রতি দিবসের মতো ঘষা মাজা মোছা কত
কোনোকর্ম না রহিল বাকি।

'দিদি'তে পশ্চিমী মজুর এবং তাদেরই ছোটো ছেলেমেয়েদের জীবনযাত্রা সৃষ্টিপ্রবণ কবিচিত্তের বেদনা-অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছে। 'পুঁটু'তেও সামান্য গৃহস্থ-যুবা ও তার পালিত পশু মোষ 'পুঁটু' কবির দৃষ্টির সম্মান লাভ করেছে। 'সঙ্গী'তে দেখা দিয়েছে 'কুকুর শিশু'র সঙ্গে বেদের মেয়ে। 'স্নেহদৃশ্যে' আছে বহু বরষের রোগে অস্থিচর্মসার শীর্ণতনু বিংশতি বৎসর বয়সের এক যুবা আর সেই মুমূর্ষুকে ক্রোড়ে নিয়ে পথের ধারে তার দৃঢ় ধৈর্যময়ী মা। "করুণা" কবিতায় আশ্চর্যভাবে দেখা মেলে এক বারাঙ্গনার।

আর চৈতালির 'সতী' কবিতাটি! উপন্যাস নয়, গল্প নয়. প্রবন্ধ নয়, দীর্ঘকাব্যকাহিনীও নয়, একটি ক্ষুদ্র সনেট! কিন্তু কোনো লেখকই কি চিরকালের মধ্যে কোনো পতিতাকে এমন মহিমায় উজ্জ্বল করে দেখাতে পেরেছেন! এ তাঁর বিখ্যাত 'পতিতা' কবিতায় বর্ণিত স্বর্গের জিনিস নয়; পৃথিবীরই বস্তির রক্ত-মাংসের মানুষ পতিতাদের কথায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

হেরি তারে, সতীগর্বে গরবিনী যত
সাধ্বীগণ লাজে শির করে অবনত
তুমি কি জানিবে বার্তা, অন্তর্যামী যিনি
তিনিই জানেন তার সতীত্ব কাহিনী।

সামান্যের এরা সব রসচিত্র—কবির রসোপলব্ধির সূত্রেই যাদের সমাবেশ। কিন্তু বিস্ময় লাগে যখন দেখা যায়, কাব্যের বিচারে এই কবিতাগুলির স্থান 'ঋতুসংহার', 'মেঘদূত' এবং ভারতের মহান ঐতিহ্যমূলক কবিতাগুলিরই পাশে। একদিকে মহান একদিকে সামান্য—এদের দুটিকেই যে বুকে করে আছে, সমগ্ররূপা সেই মাতৃভূমির কথা আবার এসে কবিচিত্ত অধিকার করেছে। সমগ্র দেশের

জাগরণই কবির লক্ষ্যবস্তু। ক্ষুদ্র গণ্ডির সমাজ থেকে বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে চলতে দেশবাসীকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন—

অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি।
রেখোনা বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী
হে জননী, আপনার স্নেহ-কারাগারে
সন্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে।
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার,
সন্তান নহে গো মাত সম্পত্তি তোমার।

এর পর 'কথা ও কাহিনী'র যুগ। অতীত দিনের স্মৃতির মধ্যে প্রত্যক্ষ বাস্তবের জনসাধারণের কথা স্থান পাবার সুযোগ নেই, কিন্তু এর মধ্যে কয়েকটি গাথায় নিপীড়িত, অধঃপতিত, বঞ্চিতদের জন্য কবির মনের সমবেদনা এবং এদের ন্যায্য অধিকারের সুদৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায়। এ দেশে 'জন্ম' দিয়েই জাতিতে মানুষ উচ্চনীচ হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জন্মের উপর গুণকে প্রাধান্য দিয়ে জন্মত ভর্তৃহীনা জবালার পুত্র সত্যকামকে সত্যবাদিতা গুণের জন্যই ব্রাহ্মণ বলে মেনে নেবার আখ্যান শুনিয়েছেন 'ব্রাহ্মণ' কবিতায়। দাসী 'শ্রীমতী' ব্রহ্মণ্য ধর্মের ধ্বজাবাহক রাজা অজাতশত্রুর প্রহরীর হাতে জীবন দিয়েও বুদ্ধের পূজার দীপ জ্বালিয়ে গেল। শ্যামা বেশ্যা,—কিন্তু প্রেমের স্পর্শমণি প্রাণে রেখে সে সোনা হয়ে গেছে—'পরিশোধে'। রাজৈশ্বর্যমদগর্বিতা বিলাসিনী রানীর স্নানযাত্রার পথে দরিদ্র প্রজার কুটির জ্বালিয়ে শীত নিবারণের যে কাহিনী আছে 'সামান্য ক্ষতি' কবিতায়, তাতে রাজার ন্যায় বিচারের মধ্যে দীনদরিদ্র সাধারণের দুঃখ বেদনা জয়যুক্ত হয়েছে। 'মূল্যপ্রাপ্তি'র নায়ক একটি মালী। তার মধ্যেও দিব্যজ্ঞান এলো। 'নগরলক্ষ্মী'তে কবি দেখিয়েছেন দুর্ভিক্ষ-

কাতর জনসাধারণের দুঃখ মিটাবার পন্থা, কোনো বড়ো একজনের কাছ থেকে নয়, দেখা গেল তা সকলের সহযোগেই মাত্র সম্ভব। বড়ো বড়ো ধনী এবং সামন্তরা যখন দুর্ভিক্ষ দমনে অক্ষমতা জানাল, একজন ভিক্ষুণী এগিয়ে এসে ভার নিল সে কাজের এবং সকলের কাছে আহ্বান পাঠাল—

আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে
তোমরা চাহিলে সবে, এ পাত্র অক্ষয় হবে
ভিক্ষা অন্নে বাঁচাব বসুধা,--
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।

মহাধনী দু'একজনের পক্ষে যা অসম্ভব, সহযোগের কৌশলে সেই সুকঠিন সমস্যাই অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়—জনহিতের এই কার্যকর পথের সন্ধান মেলে এই কবিতাটিতে। বাস্তবে দেখা যায় জনহিতকর সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলি সব এই মূল নীতিতেই পরিচালিত। 'বন্দীবীর', 'মানী', 'প্রার্থনাতীত দান', 'গুরুগোবিন্দ' প্রভৃতি কবিতায় রয়েছে জনগণের উদ্দীপনার চিত্র। বিশেষ করে জননেতার সাধনার আদর্শ রয়েছে 'গুরুগোবিন্দে'।

'কাহিনী'র 'পুরাতন ভৃত্য' বিখ্যাত। 'দুই বিঘা জমি'তে প্রজার প্রতি জমিদারের অত্যাচার ও প্রজার দুঃখ বর্ণিত। 'দীনদান' কবিতায় ঐশ্বর্য ও ক্ষমতাগর্বী রাজাকে সাধু বলছে,—

যে বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন,
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়

অরণ্যে, গ‍ুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে তর‍ুর ছায়ায়,
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দির-প্রাঙ্গণে, সে বৎসর
বিংশ লক্ষ ম‍ুদ্রা দিয়া রচি তব স্বর্ণ-দ‍ৃপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে। সেদিন কহিলা ভগবান—
আমার অনাদি ঘবে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্ত নীলিমা মাঝে; মোব ঘরে ভিত্তি চিবন্তন
সত্য, শান্তি দয়া প্রেম। দীনশক্তি যে ক্ষ‍ুদ্র কৃপণ
নাহি পাবে গ‍ৃহ দিতে গ‍ৃহহীন নিজ প্রজাগণে
সে আমারে গ‍ৃহ করে দান! চলি গেলা সেইক্ষণে
পথপ্রান্তে তব‍ুতলে দীনসাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সম‍ুদ্র মাঝে স্ফীত ফেন যথা শ‍ূন্যময়
তেমনি পবমশ‍ূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে
স্বর্ণ আব দর্পের ব‍ুদ্‌ব‍ুদ্‌।

মৌকি ধার্মিকতার উপব এই আঘাত বজ্রেব মতোই স‍ুকঠিন। এব পবেব কবিতায দেখা যায দেশেব সমাজেব মধ্যে যে নানা কুসংস্কারে জনগণ পীডিত, তাব উপবও আঘাত দেওযা হযেছে যদিও সে আঘাত প্রত্যক্ষ নয়, পবোক্ষ। 'দেবতাব গ্রাস' ও 'বিসর্জনে' সমাজেব কুনীতির উদ্দেশে সবাসবি ধিক্কাব নেই, কিন্তু তা প'ডে পাঠক মাত্রেবই মনে ধিক্কার জাগে কুসংস্কারীদের উপর সেই সমাজেব ম‍ুব‍ুব্বিদেব উপব। পবোক্ষভাবে এই ধিক্কাব উৎপাদনেব কৌশল দেশকে সচেতন কবাব পক্ষে অত্যন্ত কার্যকবী।

"কল্পনা" কাব্যে এব পবেই এসেছে—তাঁব বিখ্যাত বাণী 'ভিক্ষাযাং নৈব নৈব চ'। ভিক্ষা করে দেশেব অর্থাৎ দেশেব সর্বসাধারণের কল্যাণ আসবে না।—তা আনতে হলে চাই স্বাধীন চেষ্টা। দেশমাতৃকাকে বলছেন,—

পূণ্য হস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।
সেই সিংহাসন, যদি অঞ্চলটি পাত,
কর স্নেহ দান।
যে তোমারে তুচ্ছ করে, সে আমারে মাত
কী দিবে সম্মান।

এই স্বাধীন চেষ্টার পথে অদৃষ্টে আমাদের যাই থাকুক না কেন, কবির সংকল্প হচ্ছে,

কিসের তরে অশ্রু ঝরে
কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস,
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

এর পরই আবার 'বিদায়' কবিতায় কবি সহসা বলে উঠলেন,—

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর।

এর পরে ভারতলক্ষ্মীর বন্দনা। পরে আবার দেশের দোষত্রুটির প্রতি শ্লেষ ও বিদ্রূপও আছে, বিশেষ করে দেশের জিনিস ছেড়ে দেশবাসীর বিদেশের পদলেহন-বৃত্তির উপরেই কবির যত আক্রোশ। এর মধ্যে

দীন প্রতিবেশীবৃন্দের কথাও আছে। তাদের উপেক্ষার ক্ষেত্রেও কবির রোষ ক্ষমাহীন।

'নৈবেদ্যে'র প্রথম কবিতায় জীবনস্বামীর কাছে কবির প্রার্থনার একস্থানে আছে,—

তোমার বিচিত্র এ ভব-সংসারে
কর্মপারাবার-পারে হে,
নিখিল-জগত-জনের মাঝারে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

'নৈবেদ্যে' কবির দেবতা বিশ্বজন-ছাড়া নয়, তাঁকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন,—

বিদ্বেষ যেখানে
দ্বার হতে কারেও তাড়ায় অপমানে
তুমি সেই সাথে যাও, যেথা অহংকার
ঘৃণাভরে ক্ষুদ্র জনে রুদ্ধ করে দ্বার
সেথা হতে ফির তুমি; ... .
মহারাজ, তুমি যবে এস, সেই সাথে
নিখিল জগৎ আসে তোমারি পশ্চাতে।

নিখিল জগতের কথায় স্বদেশের কথা তাঁর মনে জেগেছে। তার শোচনীয় দুর্গতি থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করে বলছেন,—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

নাম করে জনগণের কথা স্পষ্ট না বললেও এই "দুর্ভাগ্য দেশ" শব্দ

দুটির মধ্যেই পরোক্ষভাবে জনগণেরই অনুভব রয়েছে মেশানো। সেই দুর্ভাগ্য দেশ ভারতবর্ষকে তিনি যে আদর্শে উন্নীত দেখতে চান, তাঁর সেই আদর্শের প্রেরণা ফুটেছে নিচের কবিতাটিতে।—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ-তলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বিচার স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে, কর্মধারা ধায়
অজস্র, সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

এখানে কবি জাতীয়তাবাদী, স্বদেশহিতৈষী। কিন্তু তাঁর জাতীয়তা অন্য কোনো জাতিকে অবহেলা কবে নয, অন্য কোনো দেশকে আঘাত করে ক্ষতিগ্রস্ত করে নয়। তাঁর ভারতের প্রাঙ্গণতলে সমগ্র বসুধাব অবারিত আহ্বান, তাঁর ভারতের কর্মধারা নির্বিচার স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে ধায়, আন্তর্জাতিকতার পরিপোষক হয়ে। পাশ্চাত্ত্যেব আড়ম্বরপূর্ণ জাতীয়তার সংকীর্ণ পথ কবির পথ নয়, সে পথে প্রকৃত মুক্তি আসবে না, শুধু তা মারামারি কাটাকাটি বাড়িয়ে হিংসাদ্বেষে

দেশ ছারখার করবে—কবির মতে ভারতের মুক্তি আসবে ভারতেরই নিজস্ব সংস্কৃতি ও সাধনার পথে—

যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে।
বস্তুভারহীন মন সর্ব জলে স্থলে
পরিব্যাপ্ত করি দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে।

—এই জ্ঞান, এই ধ্যান থেকে সেই মুক্তি আসবে। জীবন-দেবতাকে কবি বলছেন,—

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর। বীর্য দেহ সুখের সহিতে
সুখেরে কঠিন করি, বীর্য দেহ দুখে,
যাহে দুখ আপনারে শান্ত স্মিত মুখে
পাবে উপেক্ষিতে, ভকতিরে বীর্য দেহ
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি, বীর্য দেহ ক্ষুদ্রজনে
না করিতে হীনজ্ঞান—বলের চরণে
না লুটিতে, বীর্য দেহ চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি।
বীর্য দেহ তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।

ক্ষুদ্রজনে যারা হেয় জ্ঞান করে, তারা প্রকৃতপক্ষে দুর্বল, কবি সেই দুর্বলতা থেকে মুক্তির জন্য বীর্য চান।—"বীর্য দেহ ক্ষুদ্রজনে না করিতে হেয় জ্ঞান"—ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বজনেরই মুক্তির কথা কবির এই মঙ্গল প্রার্থনার মধ্যে নিহিত। তাঁর জাতীয়তা বা স্বদেশহিতৈষিতা শুধু শিক্ষিত সাধারণ নিয়ে নয়, দেখা যাচ্ছে বিশেষভাবে নিম্নদের ক্ষুদ্রদের কথাও তাঁর মনে রয়েছে।

সকলের মধ্যে প্রবেশের যে প্রেরণা থেকে জনগণের দিকেও তাঁর হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে, সেই প্রেরণার ধারাটি "উৎসর্গ" বইয়ের 'প্রবাসী' কবিতায় অন্তঃশীলারূপে প্রবাহিত,—

ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।
* * * *
যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধূলারেও মানি আপনা।
ছোটোবড়োহীন সবারে মাঝারে
করি চিত্তের স্থাপনা।

এর পরেই বিশ্বদেবের মূর্তি কবির চোখে ভেসে উঠেছে। কবি বলছেন,—

হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ানু বাহিরে
শুনিনু আজিকে নিমেষে,
অতীত হইতে উঠিছে হে দেব
তব গান মোর স্বদেশে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'উৎসর্গে'র সংযোজনাংশে 'জনসমুদ্রে'র আন্দোলন

কবির মনকে আলোড়িত করেছে। তারপরেই রয়েছে নবীন বর্ষে কবির গানে জনগণের সামগ্রিক ভাবরূপ সত্তা ভারতের স্তুতি এবং তার দীক্ষা গ্রহণের সংকল্প।

তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম,
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা,
তব গৌরবে গরব মানিব
লইব তোমার দীক্ষা।

'খেয়া'র মধ্যে লোকজীবনের বাণী তেমন উজ্জ্বল নয়। কবি যে বলেছেন তাঁর কাব্যপ্রেরণার দুই ধারা, একটি তার বাহিরের দিকে বাস্তবে বহুর মুখী, আরেকটি অন্তরের দিকে একার মুখী,—নানা-সময়ে এই দুটিরই জোয়ার ভাঁটা নিয়ে তাঁর কাব্যলীলা। 'খেয়া'তে বরং একার দিকেই টান। বহুর থেকে বিদায় নেবার প্রবণতা উঁকি দিলেও, শেষ প্রার্থনায আছে,—

আমি সবায় দেখে খুশি হব
অন্তরে
কিছু বেসুর যেন বাজে না আর
আমার বীণা-যন্তরে।
যাহাই আছে নয়ন ভরি'
সবই যেন গ্রহণ করি,
চিত্তে নামে আকাশ-গলা
আনন্দিত মন্ত্র রে।
সবায় দেখে তৃপ্ত রব
অন্তরে॥

'গীতাঞ্জলি'র গোড়ার দিকে কবির একার দিকে মন, কিন্তু পরে চুরাশি সংখ্যার কবিতায় এসে জীবন-দেবতাকে বলছেন,—

আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে
বিশাল ভবে
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে।
প্রবল প্রেমে সবার মাঝে
ফিরব ধেয়ে সকল কাজে
হাটের পথে তোমার সাথে
মিলন হবে,
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে।

আরেকটিতে আছে,—

তুমি যে-কাজ করছ, আমায়
সেই কাজে কি লাগাবে না।
কাজের দিনে আমায় তুমি
আপন হাতে জাগাবে না?

*　　*　　*

অন্ধকারে একা একা
সে দেখা যে স্বপ্ন দেখা,
ডাকো তোমার হাটের মাঝে
চলছে যেথায় বেচাকেনা।

এর পরেই "ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" কবিচিত্তের জাগরণ। সেইখানে নরদেবতাকে কবি বন্দনা করছেন, যেখানে আর্য, অনার্য,

দ্রাবিড়, চীন, শক, হূন, মোগল, পাঠান সব এক দেহে এসে লীন হয়েছে।

অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রথমে কবির প্রেরণা জাগছে নিখিলের মিলন চেয়ে, নিখিলের কথা জাগতেই স্বদেশের কথা এসে পড়ে, প্রেরণা হয় স্বদেশমুখী; এই নিখিল ও স্বদেশ হচ্ছে ছোটোবড়ো, উচ্চনীচ, সকলের সমষ্টিরূপ,—তারপর সেই একই প্রেরণা নিয়ে যায় আবো বিশেষ পথে,—সেই পথই নিম্ন ক্ষুদ্র জনগণের পথ 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন', এবং সেইখানেই ঈশ্বরের চরণ বিরাজ করে। একটি কথা স্মরণীয় যে, কবির বাণী বরাবরই আস্তিক্য-বাদের বাণী। তাঁর কাছে সব কিছুরই মূল উৎস ঈশ্বর, সকলের কল্যাণেই যাঁর প্রীতি। 'গীতাঞ্জলি'তে অন্তরতম এই ঈশ্বরের সঙ্গে কবির নিভৃত ব্যক্তিলীলার আকূতি ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু তারই মধ্যে আবার "ভজন পূজন আরাধনা সমস্ত" ছেড়ে তিনি "রুদ্ধদ্বারের দেবালয়ের" অন্ধকার কোণ ফেলে বেরিয়ে গেছেন দেবতাকে পেতে, "যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ", রৌদ্রজলে সবাই যেখানে খাটছে সেই কর্মীদের মধ্যে। অপমানিত, বঞ্চিত, অস্পৃশ্য নিম্নসাধারণের দুঃখ দুর্গতির কথা, তাদের প্রতি দেশের অবিচারের কথা 'গীতাঞ্জলি'তেই প্রথম কবির হাতে সুনির্দিষ্ট রূপ পেয়েছে।

'গীতিমাল্যে'ও এই দীনদের তিনি জীবন-দেবতার থেকে দূরে দেখতে পাচ্ছেন না।—

> জ্বলে নেভে কত সূর্য
> নিখিল ভুবনে।
> ভাঙে গড়ে কত প্রতাপ
> রাজার ভবনে।
> তারি মাঝে আঁধার রাতে
> পল্লীঘরের আঙিনাতে

দীনের কণ্ঠে নামটি তোমার
উঠছে গগনে॥

কবি চাইছেন—

ওদেব সাথে মেলাও, যাবা
চবায তোমাব ধেনু।

'গীতালি'তে এই জনগণেব ধাবা মাত্র একটি স্থানে অন্তঃশীলা হযে চলেছে, যেখানে বলছেন,—

বিশ্বজনেব পাযেব তলে ধূলিময যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায নিযে সবাব মাঝে লুকিযে আছ তুমি
সেই তো আমাব তুমি।

'বলাকা'ব গোড়াতেই 'উৎসর্গে' মেলে এই ধাবাটিব বেখাচিহ্ন: বইখানি যাঁকে উৎসর্গ কবেছেন, ছোটোদেব প্রতি সেই জনহিতৈষী পিযার্সন সাহেবেব প্রাণেব টান লক্ষ্য কবে কবি তাঁকে অভিনন্দিত কবে লিখেছেন,

ছোটোবে কখনো ছোটো নাহি কব মনে,
আদব কবিতে জানো অনাদৃত জনে।

এব পবে শিশুদেব জবানীতে নানাকথাব মধ্যে "শিশু ভোলানাথে'র 'মূর্খু' কবিতায কবিব বসসৃষ্টিপ্রবণ মনেব লক্ষ্যবস্তু হযেছে গাঁযেব কৃষাণ ছেলে, গাড়োযান, এ ছাড়া ঐ গ্রন্থে "বাজমিস্ত্রি'ব উপবেই আব-একটি কবিতা আছে।
'পূববী' কাব্যে ঘবেব খববের জন্য উৎসুক কবি যে 'চিঠি' লিখেছেন, তাব মধ্যে ফুটেছে কিছু লোকজীবনেব বাণী।

ঘরের খবর পাইনে কিছুই, গুজব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পুলিশ সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।

* * *

রাজপ্রতাপের দম্ভ সে তো এক-দমকের বায়ু,
সবুর করতে পারে এমন নাইতো তাহার আয়ু।
ধৈর্য বীর্য ক্ষমা দয়া ন্যায়েব বেড়া টুটে
লোভের ক্ষোভের ক্রোধের তাড়ায় বেড়ায় ছুটে ছুটে।
আজ আছে কাল নাই ব'লে তায় তাড়াতাড়ির তালে
কড়া মেজাজ দাপিয়ে বেড়ায় বাড়াবাড়ির চালে।
পাকারাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি
ভগবানের ব্যথার পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ি।

* * *

প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হ'ক বাঙালীর জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।

'পরিশেষ' কাব্যের 'আহ্বান' কবিতায় কবি বাঁশি শুনেছেন বারে বারে ; যিনি তাঁকে ডাকছেন, তিনি যে কোথায় কখন্ আসন সাজিয়ে রেখেছেন কোথায় তার জন্য প্রতীক্ষা করছেন, এই কথা তাঁকে শুধাতে গিয়ে কবি এক জায়গায় বলছেন,—

কেমনে বুঝি আমারে খুঁজি কোথায় তুমি ডাক,
বাজিয়া উঠে ভীষণ তব ভেরি।

শরম লাগে, মন না জাগে, ছুটিয়া চলি নাকো,
দ্বিধার ভরে দুয়ারে করি দেরি।
ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে,
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেইখানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে।

এর পরে একটি কবিতায় আছে জনগণের মুক্তিসাধক রাজবন্দীদের অভিনন্দন, যারা "মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী"। প্রভু রাজশক্তির হাতে মুক্তি-সেনাদের নির্যাতনে, বিক্ষুব্ধচিত্ত কবি ভগবানকেই সোজাসুজি প্রশ্ন করেছেন,—

আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাইতো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

'পুনশ্চ' কাব্যের প্রথম কবিতা 'কোপাই'তে সাধারণের সঙ্গে কবির প্রাণ মিশেছে স্বাভাবিকভাবেই,—

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিল,
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুকহাতে
সাঁওতাল ছেলে।

পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা;
আর মাসিক তিনটাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

'খোয়াই' কবিতায় খোয়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনছন্দ মিলিয়ে কবি বলছেন,—

এসেছিলেম বালক কালে।
ওখানে গুহাগহ্বরে
ঝিরঝির ঝরনাধারায়
রচনা করেছি মনগড়া রহস্যকথা,
খেলেছি নুড়ি সাজিয়ে
নির্জন দুপুরবেলা আপনমনে একেলা।
তারপরে অনেকদিন হোলো,
বয়ে গেল অনেক বৎসর।
রচনা করতে বসেছি একটা কাজের রূপ।
আমারও যখন শেষ হবে দিনের কাজ,
তারপরে?
তারপরে রইবে উত্তরদিকে
ঐ বুকফাটা ধরণীর রক্তিমা,
দক্ষিণ দিকে চাষের খেত
পূর্বদিকের মাঠে চরবে গোরু।

রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে
গ্রামের লোক যাবে হাট করতে।
পশ্চিমের আশ্রমপ্রান্তে
আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জন রেখা।

দেখা যায়, এই শেষদিনগুলিতে গ্রামের লোকেরা কবির অনুভূতি থেকে দূরে পড়েনি, আছে তাতে মিশিয়ে। লোকজীবনের বাণীর দিক দিয়ে নয়, কিন্তু রসদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এই বইয়ের নানা কবিতায় ক্ষুদ্র সাধারণ কয়েকটি নরনারী, বালক এবং তুচ্ছ প্রাণীরাও। এর মধ্যে আছে, "মাথায় ভিজে চাদর জড়ানো গা-খোলা মোটা মানুষটি", আছে বালক তিনু, আছে ছেলেটা, সহযাত্রী, হিরণ মাসির মা-মরা বোনপো, 'ক্যামেলিয়া'র সাঁওতাল মেয়েটি, আছে শালিখটা, সাধারণ মেয়ে, আধবুড়ো একজন হিন্দুস্থানী, কিনু গোয়ালার গলির সেই বাঁশি-ওয়ালা, সওদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি এবং 'উন্নতি' কবিতার নায়ক "আমি"। বইয়ের শেষদিকে আছে, সমাজে যাদের ছোটোলোক বলে, সেই অন্ত্যজ শ্রেণীর চণ্ডাল নাভা এবং জোলা কবীরকে বুকে ধরে গুরু রামানন্দের শুচি হওয়ার কাহিনী; 'রং-রেজিনী' কবিতায় পণ্ডিত শংকর মান বিকিয়ে দিয়েছে রং-রেজিনী আমিনার একটি কথায়। এমনি 'মুক্তি' কবিতায় কীর্তনওয়ালির গানে পথের পথিক হয়ে গেছে বাজিরাও পেশোয়া তার অভিষেক-দিনে। 'প্রেমের সোনায়' চামার রবিদাসকে গুরু রামানন্দ দিলেন কোল, আবার রবিদাসের গান শুনে "হরিপ্রেমের দীক্ষা নিলেন রাজরানী" চিতোরের। গুরু রামানন্দের 'স্নান-সমাপন' হোলো তখন, যখন তিনি ভাজন মুচিকে ধুলো থেকে নিলেন বুকে তুলে,—

ভাজন ব্যস্ত হয়ে উঠল

"কী করলেন প্রভু,
অধমের ঘরে মলিনের গ্লানি লাগল পুণ্যদেহে।"
রামানন্দ বললেন,
"স্নানে গেলেম তোমাদের পাড়া দূরে রেখে
তাই যিনি সবাইকে দেন ধৌত করে
তাঁর সঙ্গে মনের মিল হোলো না।
এতক্ষণে তোমার দেহে আমার দেহে
বইল সেই বিশ্বপ্লাবনধারা।
...মন্দিরে আর হবে না যেতে।"

এর পরে 'প্রথম পূজা', ত্রিলোকেশ্বরের মন্দিরে কিরাত দলপতি মাধবকে নিয়ে। অস্পৃশ্যের জীবন-দেওয়া প্রাণের পূজার কাছে রাজার ঐশ্বর্যের পূজা গেছে ম্লান হয়ে। 'ঘর-ছাড়া' কবিতায় দেখা দিয়েছে একটি সাধারণ লোক, সে এসেছে বটে জর্মানি থেকে কিন্তু—

সব মানুষের ভিতর দিয়ে
আনাগোনার বড়ো রাস্তা তৈরি হবে,
এরাই আছে সেই রাস্তার কাজে
এই যত সব ঘর-ছাড়াদের দল।

"মানবপুত্র" কবিতায় রবাহূত অনাহূতদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন যে খৃষ্ট তাঁর বেদনার মধ্য দিয়েই বর্তমানের হিংসোন্মত্ত বিশ্বমানব-সাধারণের হত্যামহোৎসবে উত্তেজিত কবি আপন বেদনা প্রকাশ করেছেন মর্মবিদারক ভাষায়। আর একটি আশ্চর্য কবিতা রয়েছে এই বইয়ে—ভাষায়, রচনাকৌশলে, সুবিন্যস্ত ভাব-উদ্ভাবনে,—এ মানুষের চিরসম্পদ্, এ বাণী ভাগ্যে-পাওয়া, ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন,—

সেই বাণী রয়েছে 'শিশুতীর্থ' কবিতায়! মানব-সভ্যতার প্রলয়রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে,—

"রাত কত হল, উত্তর মেলে না।...
ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়শিখা?
মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়াপাতার মতো ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে বিভীষিকার উল্কিপরানো।

* * *

ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত,
তুষার শুভ্র নীরবতার মধ্যে;—
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখি চীৎকারশব্দে
যখন উড়ে যায়,
সে বলে, ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান বলে জেনো।
ওরা শোনে না, বলে, 'পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি'
বলে, 'পশুই শাশ্বত

* * *

বলে মানুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে,
মরীচিকার অধিকার নিয়ে
হিংসাকণ্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে।
মেঘ গেল সরে।..
ভক্ত বললে, সময় এসেছে।...যাত্রার।
কে...সবার কানে কানে বললে...
চলো সার্থকতার তীর্থে।.
এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে
একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠল।...

যাত্রীরা চারদিক থেকে বেরিয়ে পড়ল...
ভিক্ষু আসে ছিন্ন কন্থা প'রে...
আর...রাজ অমাত্যের দল,...
অধ্যাপককে ঠেলে চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক।
মেয়েরা চলেছে, কত মাতা, কুমারী, কত বধূ,...চলেছে
পঙ্গু খঞ্জ, অন্ধ আতুর, আর সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী...
ভক্ত চলেছে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,
তরুণ এবং জরাজর্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা, আর
যারা অর্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।"

কবিতাটিতে এর পরে আছে, চলতে চলতে অবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ভক্তকে যাত্রীরা মেরে ফেললে। কিন্তু তারপরেই—

"যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।
রাত্রি পোহাতে চায় না।
তারা শুধোয় কে আমাদের পথ দেখাবে?
পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে, যাকে মেরেছ সেই।"

এর পর যাত্রীদের মধ্যে জাগল অনুশোচনা।

"সকলে মিলে গান ধরল
জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়।
তরুণের দল ডাক দিল, চলো যাত্রা করি,
প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে,
হাজার কণ্ঠের ধ্বনিনির্ঝরে ঘোষিত হল—
আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর।"

উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক, মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেছে সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ। তাবা আর পথ শুধোয় না, তাদের মনে নেই সংশয়, চরণে নেই ক্লান্তি। মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে; সে যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জীবনের সীমাকে করেছে অতিক্রম (তুঃ পূরবীর 'চিঠি' কবিতায়—"মৃত্যু যারা জয় করেছে" ইঃ)। তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে যেখানে বীজ বোনা হোলো, সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে, যেখানে শস্য হয়েছে সঞ্চিত, সেই অনুর্বর ভূমির উপর দিয়ে যেখানে কঙ্কালসার দেহ বসে আছে প্রাণের কাঙাল; তারা চলেছে প্রজাবহুল নগরের পথ দিযে, চলেছে জনশূন্যতার মধ্যে দিয়ে যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ; চলেছে লক্ষ্মী-ছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্রূপ করে।

প্রত্যুষের প্রথম আভা।...

গিরিপদবর্তী গ্রাম থেকে নদীতলবর্তী গ্রাম পর্যন্ত প্রতিদিনের লোকযাত্রা শান্তগতিতে প্রবহমাণ।

কুমোরের চাকা ঘুরছে গুঞ্জনস্বরে,

কাঠুরিয়া হাটে আনছে কাঠের ভার, রাখাল ধেনু নিয়ে চলেছে মাঠে, বধূরা নদী থেকে ঘট ভ'রে যায় ছায়াপথ দিয়ে। কিন্তু কোথায় বাজাব দুর্গ, সোনার খনি, মারন-উচাটনমন্ত্রের পুরাতন পুঁথি?

তালিকুঞ্জতলে একটি পর্ণকুটীর অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত। দ্বারে অপরিচিত সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে বলছে,— মাতা দ্বার খোলো।

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্যক হয়ে পড়েছে।

সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়িতে নাড়িতে যেন শুনতে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরম বাণী, মাতা দ্বার খোলো।

* * *

দ্বার খুলে গেল।
মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর
শিশু, উষার কোলে যেন শুকতারা।
...গান উঠল আকাশে,—
"জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই
চিরজীবিতের।"

সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়—উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে, "জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের"।

মানবলোকে নবজাতকই চিরকাল নিয়ে আসছে চির নূতনের বাণী; তার কাছেই পৃথিবীর চির আশা; যুগে যুগে মানুষের অভিযান নূতন করে আরম্ভ হয়েছে ওই নবজাতকদের থেকেই—কবিও তাদেরই প্রতি ইঙ্গিত করে 'শিশুতীর্থে' মানবের জয় ঘোষণা করলেন।

'শেষ সপ্তকে'র যুগে 'আমি' নামক একটি কবিতায় সর্বসাধারণের ধারাটি একটি জায়গায় তার নিদর্শন রেখে গেছে; কবি বলছেন,—

এমনি করে দিন কেটেছে, হবে সেদিন সারা
বেয়ে সর্বসাধারণের ধারা।

'বীথিকা' কাব্যের 'সাঁওতাল মেয়ে' কবিতায় এই মানব-সাধারণের একজন—সহজ সুন্দর এক সাঁওতাল-নারীকে, মজুরির কাজে খাটতে দেখে মানবতার দুর্গতিতে ব্যথিত কবি কতকটা সংকোচে ভাবছেন,—

এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা
শুশ্রূষার স্নিগ্ধ সুধাভরা,
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরি,
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।

'গর্বিনী' কবিতায় আবার এক-নারীকে উদ্দেশ করে বলছেন,—

কে গো তুমি গর্বিনী, সাবধানে থাক দূরে দূরে,
মর্ত্যধূলি'পরে ঘৃণা বাজে তব নূপুরে নূপুরে।
তুমি যে অসাধারণ, তীব্র একা তুমি,
আকাশকুসুমসম অসংসক্ত রয়েছ কুসুমি।
* * * * *
আমি সাধারণ।
এ ধরাতলের
নির্বিচার স্পর্শ সকলের
দেহে মোর বহে যায়, লাগে মোর মনে—
সেই বলে বলী আমি, স্বত্ব মোর সকল ভুবনে।
মুক্ত আমি ধূলিতলে.
মুক্ত আমি অনাদৃত মলিনের দলে।
যত চিহ্ন লাগে দেহে, অশঙ্কিত প্রাণের শক্তিতে
শুদ্ধ হয়ে যায় সে চকিতে।

'পত্রপুট' কাব্যের পাঁচ সংখ্যক কবিতায় হাটের ছোঁয়া লেগেছে কবির মনে। মহাজনের টিনের ছাদ, শাকসবজির ঝুড়ি-চুপড়ি, আটিবাঁধা খড়,

হাঁড়িমালসার স্তূপ, নতুন গুড়ের কলসির সঙ্গে দেখা দিয়েছে সেখানে পথের ধারে অশথ ছায়ে অন্ধ বৈরাগী, উঠছে কেনাবেচার বিচিত্র গোলমাল, একজোড়া মোষ উদাস চোখ মেলে বয়ে চলেছে বোঝাই গাড়ি, চাকার পাকে পাকে টেনে তুলছে কাতর ধ্বনি। কেরোসিনের দোকানের সামনে একজন একেলে বাউল।...লোক জমেছে চারিদিকে, ...অদ্ভুতেরও সংগতি আছে এইখানে, এও এসেছে হাটের ছবি ভরতি করতে।

দশ সংখ্যক কবিতায় রয়েছে মানুষের মহৎ স্বরূপের পরিচয়; সবিতাকে উদ্দেশ করে কবি বলছেন,—

তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ
আপনার মহৎ স্বরূপকে দেখেছে কালে কালে,
কখনো নীল মহানদীর তীরে,
কখনো পারস্যসাগরের কূলে,
কখনো হিমাদ্রি-গিরিতটে,—
বলেছে, জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র,
বলেছে, দেখেছি অন্ধকারের পার হতে
আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের আবির্ভাব।

বারো সংখ্যক কবিতায় বলা হয়েছে,—

জীবনের পথে মানুষ যাত্রা করে
নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে।
গান যে-মানুষ গায়, দিয়েছে সে ধরা, আমার অন্তরে;
যে-মানুষ দেয় প্রাণ, দেখা মেলেনি তার।

পূর্বাপর কয়েকস্থলেই কবির এই আত্মবিশ্লেষণমূলক বাণীর সাক্ষাৎ মেলে। অতি প্রথমে বলেছেন, বিশ্বের মাঝে ঠাঁই নেই বলে বঙ্গভূমি কাঁদছে, "গান গেয়ে কবি জগতের তলে স্থান কিনে দাও তুমি।" তার পরে "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটিতে বলেছেন,—

—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে তবে তাই কর আজি দান,—

এখানে প্রাণ হচ্ছে প্রেরণা, গানের মধ্য দিয়ে যার প্রকাশ, সেখানে মূক মুখে ভাষা দিযে শত শত অসন্তোষকে মহা গীতে নির্বাণ লাভ করাবার কাজই কবি গ্রহণ করেছেন। জনসাধারণের কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু প্রাণোৎসর্গ করে মানুষের মুক্তির কাজে নামতে না পারার মনঃক্ষুণ্ণতা,—এই অক্ষমতার বেদনা ও আত্মগ্লানি যেন ভিতরের একটা আকস্মিক প্রবল ধাক্কায় এক-এক সময় ভাষায় বেরিয়ে পড়েছে। এখানে বলছেন,—

দেখেছি শুধু আপনার নিভৃতরূপ
ছায়ায় পরিকীর্ণ,
যেন পাহাড়তলিতে একখানা অনুত্তরঙ্গ সরোবর।
* * * * *
মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।
দুর্গম ভীষণের ওপারে

অন্ধকারে অপেক্ষা করছে জ্ঞানের বরদাত্রী,—
মানবের অভ্রভেদী বন্ধনশালা
তুলেছে কালো পাথরে গাঁথা উদ্ধত চূড়া
সূর্যোদয়ের পথে;
ব্যূহ ভেদ ক'রে
স্থান নিইনি যুধ্যমান দেবলোকের
সংগ্রাম সহকারিতায়।

* * * * *

যুগে যুগে যে-মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়,
শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে,
মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে॥

এখানে দেখবার বিষয়, কবি এই সময়ে সর্বমানবিক অনুভবের থেকেই মানুষের কথা ভাবছেন, বলছেন। সাধারণভাবে মানুষের দুঃখদুর্গতি বা তার মহিমা, সে তার চোখের উপরকার স্বজাতি, স্বদেশেরই হোক, বা দেশবিদেশের নানাজাতিরই হোক, যেখানকার মানুষের যা-কিছু ভালোমন্দ তিনি দেখছেন, সে সমস্ত নিয়েই দেশ-কাল-জাতি অবস্থার সীমাপেরনো সাধারণ এক মানব-প্রীতির প্রবর্তনায় তিনি তাঁর কথা বলে যাচ্ছেন। বিশেষ করে জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা বা কোনো শ্রেণীচেতনাবাদের নাম-ছাপা সে কথা নয়, কিন্তু সে কথা তার জাতি, দেশ, সম্প্রদায় এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণীরও কথা। এইজন্যই তিনি সকলের, একান্তভাবে তিনি কারো একলা-গণ্ডির

নন। যে নিখিল মানুষের কথা মনে রেখে প্রথম থেকে গান শুরু করেন, মধ্যবয়সে কিছুদিন বাস্তবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জাতি বা দেশের গণ্ডিতে থেকে ভারতের নাম সে গানে যোগ করেছিলেন মাত্র, কিন্তু শেষ-জীবনে দেখা যাচ্ছে আবার সেই সর্বমানবিক চেতনাই প্রবল হয়ে উঠে তাঁর গানকে করে তুলেছে সকল মানুষের গান এবং ক্রমে তা আরো বাস্তব-ঘেঁষা হয়ে হাটবাটের দীনদরিদ্র সাধারণের অভিমুখী হয়ে পড়েছে, এমন কি তাদের জীবনে জীবন মিলিয়ে তাদের গান গাইতে কবি ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। পত্রপুট' কাব্যেই মনে করিয়ে দেয় কবির শেষদিনকার সেই বিখ্যাত 'ঐক্যতান' কবিতার কথা। তাতে ডাক দিয়েছেন তিনি আর-এক কবিকে, যা নিজে দিয়ে যেতে পারলেন না সেই বাণীর জন্য। এখানে সাধারণভাবে নিখিল মানবের মধ্যে থেকে বলছেন, সেখানে এই বেদনা নিয়েই গেছেন তিনি মানবের আরো বিশেষ শ্রেণীতে, দুর্গতদের সীমায়। বলেছেন কৃষক, তাঁতী, কুলিমজুর প্রভৃতি নিম্নসাধারণের কথা, যাদের জীবনে তিনি নিজে পাননি 'প্রবেশের দ্বার'। শেষজীবনে এদের কথাই আরো স্পষ্ট আরো তীক্ষ্ণ তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর কাব্যে, এই বইতেও একটু পরেই 'পনেরো' সংখ্যক কবিতায় অন্ত্যজ ও মন্ত্রবর্জিতদের জন্যে তাঁর বেদনা তাঁকে তাদেরই একজন ব'লে অনুভূতির ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে এক করিয়ে দিয়েছে। বলেছেন,—

কবি আমি ওদের দলে–
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
পূজারি প্রশ্ন করে, "কোনো জাত নেই বুঝি তোমার?"
আমি বলি "না"।
* * * * *
দলের উপেক্ষিত আমি,

মানুষের মিলনক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।

* * * * *

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হোলো
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

'ষোলো' সংখ্যক কবিতাটিতে প্রশস্তি রয়েছে 'ছায়াবৃতা' আফ্রিকা মহাদেশের, "কালো ঘোমটার নীচে অপরিচিত যার মানবরূপ উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে"। স্বদেশের অন্ত্যজদের প্রতি চোখ পড়েছে, তাদের অবস্থা ভাবতে ভাবতে সমবেদনার স্রোতে মন ভেসে গিয়ে লেগেছে বিশ্বের অপর-এক অপাংক্তেয় ঘাটে আফ্রিকার কূলে। মন এখানে ঘর থেকে বিশ্বমুখী। শুধু দেশের অন্ত্যজ নয়, দেশবিদেশের নির্যাতিতদের বেদনাই বিশ্বকবির প্রাণে পুঞ্জীভূত। আফ্রিকার কথায় যুগান্তরের কবিকে আহ্বান করে বলছেন,—

দাঁড়াও ঐ মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো আমায় ক্ষমা করো,
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

এর পরের কবিতায় মানুষের যুগযুগসঞ্চিত ঘৃণাহিংসাদ্বেষ, অন্যায় অবিচারের ফল অবশ্যম্ভাবী যে বিশ্বযুদ্ধ, সে "যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে"। তার পৈশাচিকতা নিয়ে ধিক্কার ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের সুরে গভীর মর্মব্যথা উঠছে ঝিলিক মেরে।

পরবর্তীকাব্য 'শ্যামলী'তে রয়েছে চিরযাত্রী মানুষের কথা। যুদ্ধবিগ্রহ জয়-পরাজয় সবার উপরে তাদের জন্য কবির বাণী—"পেরিয়ে চলো, পেরিয়ে চলো।"

'অমৃত' গ্যাথাটির নায়ক এই যাত্রীদের একজন।—লোকপ্রবাদ :—"ওর বুদ্ধির কাঁচাফলে ঠোকর দিয়েছে, রাশিয়ার লক্ষ্মীখেদানো বাদুড়টা।" দেখা যায়, পরে তার স্থান হয়েছে "জেলখানায়"। নিখিল জনগণের জাগরণকেন্দ্র রাশিয়ার কথা কবির কাব্যে এই প্রথম উল্লিখিত হল। এখানে এটুকুও সঙ্গে সঙ্গে বলে নেওয়া ভালো যে, এই জনজাগরণকে ভালো বলেই যেমন কবি মনেপ্রাণে তার প্রসার চেয়েছেন, তেমনি তার জাগ্রত সংঘবদ্ধ বিপুল শক্তি থেকে কোনো অন্যায় আচরণকে জনগণের বলে তিনি উপেক্ষা করে যাননি বা অপরাধের গুরুত্বের মাত্রা কিছু কম করে দেখেননি। বেশি কথা না বলে শুধুমাত্র এমন করে সে আচরণকে বর্ণনা করেছেন যে সেই নিরলংকার বর্ণনাকৌশলই তার শোচনীয় অন্যায়ের প্রতি লোক-ধিক্কারকে আপনি জাগিয়ে দেয়। কিন্তু কবিকে সে অপ্রিয় কাজে দায়ী করবার উপায় নেই; বরং তাঁর বেদনাই তাতে প্রকাশ পেয়ে জনগণের কাছে তাঁকে তাদেরই একজন মরমী ক'রে তুলেছে। ছোটোদের ব্যথার ব্যথী হলেও অন্যায়ের সমর্থক তিনি কোনোকালেই নন, বড়োদের অন্যায় হলে তো ননই, ছোটোদের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিবাদ বজ্রগর্ভ। এই মন্তব্যের সমর্থক উদাহরণ হচ্ছে 'সানাই' গ্রন্থের 'অপঘাত' কবিতাটি। সেখানে বিশ্বের গণশক্তি-শ্রেষ্ঠ এই উল্লিখিত রাশিয়ারই ফিনল্যান্ড আক্রমণ নিয়ে কবির প্রতিবাদ শেষ দুটি পংক্তিতে চিরতরে রাশিয়াকে কালিমালিপ্ত করে রয়েছে,—

টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিন্‌ল্যান্ড্‌ চূর্ণ হোলো সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।

'প্রহাসিনী' কাব্যের সর্বশেষ কবিতা 'মাল্যতত্ত্বে' কবি সমসাময়িক জনতাঘেঁষা বাস্তবসাহিত্যের উগ্র নগ্ন প্রকাশভঙ্গির প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন। ভঙ্গিটা তাঁর কাছে আপত্তিকর কিন্তু বিষয়ের অনুভূতিটা খাঁটি হলে কবির কাছে চিরকালই তা আদরণীয়। সেখানে উচ্চনীচ বলে, বিষয় থেকে রসগ্রহণের পক্ষে বাধা থাকতে পারে না।
'সেঁজুতি'র 'জন্মদিন' কবিতায় কবি যুদ্ধরত পৃথিবীর অবস্থা ভেবে বলছেন,—

মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।

এখানে তাঁর কাজ কী, আর কীই বা করার আছে? কিন্তু এই দানবীয় নির্লজ্জ লীলার সামনে কিছু না করেও তিনি একরকম দুঃসহ যন্ত্রণাই বোধ করছেন, অন্তত আর-কিছু করতে না পারলেও, বলছেন,—

তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারেবারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপ-দেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত-অধ্যায়।

'পত্রোত্তর' কবিতায় 'চিরযাত্রী'রই গতিস্পন্দনে আন্দোলিতচিত্ত কবি বলছেন,—

ওই শুনি আমি চলেছে আকাশে বাঁধনছেঁড়ার রবে
নিখিল আত্মহারা।
ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা।
সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে,
এ ধরণী হতে বিদায়-নেবার ক্ষণে;
* * * * *
জীবনের যাহা জেনেছি, অনেক তাই,
সীমা থাকে থাক, তবু তার সীমা নাই।
নিবিড় তাহার সত্য আমার প্রাণে
নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া নিজেরে জানে॥

কবির কাব্যে এবারে বিদায়-নেবার সুর জেগেছে, এখান থেকে দৃষ্টিতেও চিরকালের থিতিয়ে-জমা শান্তরসাশ্রিত নতুন জীবনের ছবি জাগছে। 'নতুন কাল' কবিতায় বলছেন,—

ইতিহাসের গ্রন্থে আরো খুলবে নূতন পাতা,
নূতন রীতির সূত্রে হবে নূতন জীবন গাঁথা।
যে হোক রাজা যে হোক মন্ত্রী কেউ রবে না তারা
বইবে নদীর ধারা,
জেলেডিঙি চিরকালের, নৌকো মহাজনী,
উঠবে দাঁড়ের ধ্বনি।

এখানে জনজীবনের চিরকালীন রসে শান্তরসাস্পদ কবিচেতনাকে

পেয়ে বসছে; পরে দেখা যাবে, এই জনজীবনের শাশ্বত সত্যতায় তিনি আরো একান্ত করে বিশ্বাসবান হয়ে তারই প্রশস্তি গেয়ে চলেছেন। এখান থেকেই তাঁর মনে ক্রমে আরো স্পষ্ট হয়ে এই কথাটা ভেসে উঠছে যে,—

কিন্তু যাদের নাই কোনো সংবাদ,
কণ্ঠে যাদের নাইকো সিংহনাদ,
সেই যে লক্ষ কোটি মানুষ কেউ কালো, কেউ ধলো,
তাদের বাণী কে শুনছে আজ বলো।
তাদের চিত্ত-মহাসাগর উদ্দাম উত্তাল
মগ্ন করে অন্তবিহীন কাল;
ঐ তো তাহা সম্মুখেতেই, চারদিকে বিস্তৃত
পৃথ্বীজোড়া মহাতুফান, তবু দোলায়িনি তো
তাহারি মাঝখানে বসা আমার চিত্তখানি।

জীবনমৃত্যুর প্রান্তসীমায় থেকে লেখা তাঁর 'প্রান্তিক' কাব্য। সেখানে কবি বিক্ষুব্ধ। আকস্মিক ব্যাধির কবল থেকে মুক্তি পেয়ে লুপ্তিগুহা হতে সেদিন চৈতন্য ফিরে এল—"কোন্ নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে"! সেখানে যে "তপ্তধূমে গর্জি উঠি ফুঁসিছে সে (নরকাগ্নিগিরিগহ্বর) মানুষের তীব্র অপমান।" "রাষ্ট্রপতি যত আছে প্রৌঢ় প্রতাপের" তারা গুপ্ত মন্ত্রণায় রত, "এদিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদী পার হতে যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি।" যুদ্ধের এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে মহাকালের বিচারকের কাছে কবির প্রার্থনা,—

মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নরঘাতী

কুৎসিত বীভৎসা 'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল র'বে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে॥

কবির নিজস্ব যা হাতিয়ার, সেই কথার উপরই কবির যা ভরসা। তাই আর-কিছু করতে না পারলেও এই প্রার্থনার মধ্যে সেই কথাতেই ধিক্কার রেখে গেলেন অত্যাচারীদের উপর। সম্মুখে এখন শান্তি নয়, অনেক পাপ জমা আছে, দানব আছে অসংখ্য,—এখন সংগ্রামের দিন, সংগ্রাম ছাড়া দানবদের থেকে কোনো অধিকারই সহজে মিলবে না, কোনো শান্তিই আসবে না জগতে। তাই 'প্রান্তিকে'র শেষ কবিতায় কম্বুকণ্ঠে বেজে উঠেছে,—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত-বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে॥

মহাযুদ্ধের পৃথিবীর এই প্রলয়-শ্মশানে দাঁড়িয়েও কবি আশা হারাননি, এরই মধ্যে নূতন জীবন, নূতন যুগবাহী তরুণ সেবকদের আবির্ভাব কামনায় অন্তর তাঁর সর্বদাই আশান্বিত, বাণী তাঁর সর্বদাই উদ্দীপনাময়।

'আকাশ প্রদীপ' কাব্যের 'যাত্রা' কবিতাটিতে কবি রূপকচ্ছলে যে একটি গল্পাভাস ফুটিয়েছেন, তাতে দেখা যায় স্বপ্নের মধ্যে কবি

আছেন ইস্টিমারের "উপরতলার সারে"। আরো ক্যাবিন সারি সারি "নম্বরে চিহ্নিত, দেয়ালে ভিন্নিত"। যাত্রীদের "ভিন্ন ভিন্ন চাল"...।

প্রত্যেকেরই রিজার্ভ করা কোটর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র;
দরজাটা খোলা হোলেই সম্মুখে সমুদ্র,
মুক্ত চোখের 'পরে,
সমান সবার তরে,
তবুও সে একান্ত অজানা,
তরঙ্গ-তর্জনীতোলা অলঙ্ঘ্য তার মানা।

কবির "হঠাৎ কেন খেয়াল গেল মিছে,
জাহাজখানা ঘুরে আসি উপর থেকে নিচে।"

কিন্তু খানিক যেতেই পথ হারালেন। স্টুয়ার্ডকে ঘরের পথ শুধুতেই, সে বললে,—

"নম্বর তার কত"।

কবি বললেন,—

"নম্বরটা মনে আমার নেই"।

আবার ঘুরে বেড়ান আগে পাছে, আর দেখেন কোন্ ক্যাবিনের নম্বর কী আছে। কবি বলছেন,—

"যেটাই দেখি মনেতে হয় এইটে হোতে পারে",

সবটাতেই নিজের আবাস মনে করার মন ভাব মধ্যে জেগেছে এবং সর্বত্র প্রবেশের ব্যাকুলতা দেখা যাচ্ছে,—কোনোটাই তাঁর কাছে ফ্যালনা নয়।—বহুপূর্বে জীবনারম্ভে,—

ঘরে ঘরে মোর ঘর আছে আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া;

—'পত্রপুটে' প্রকাশমান দেখা গেছে এই বুভুক্ষু "সর্বগ্রাসী চেতনা"কে এবং এরপরে শেষদিকে গেছেন চলে আরো অলিগলিতে কিন্তু বলেছেন সেখানে,—

পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।

যদিও এই 'যাত্রা' কবিতাটি তাঁর স্বপ্নকথা, তবু এর রূপকের ফাঁক দিয়েই কবির সর্বজনমুখী মনের গতির একটি বিশেষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এই সর্বজনমুখী অনুপ্রেরণাই কবিকে 'সময়হারা' কবিতাতে পুতুল-গড়া কারিকরের ভূমিকাতেও দাঁড় করিয়েছে। তাঁর কাছে সকলেরই যাতায়াত, সকলের প্রতি তাঁরও সমাদরের স্বীকৃতি, মাতাল, চোর, মনিব-হারা কুকুর—কারোর প্রতি নেই তাঁর উপেক্ষা, বরং দরদেরই সুর লেগেছে এই অবজ্ঞাত সামান্যদের প্রতি।

দেশের সাময়িক অবস্থা কবির অনেক কবিতারই মূল প্রেরণা জুগিয়েছে, আগেও অনেক পাওয়া যাবে তার দৃষ্টান্ত, এ বইতে তার আর-একটি উদাহরণ হচ্ছে 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' কবিতাটি। সারা বাংলার পল্লীঅঞ্চলের সাধারণ লোকদের মধ্যে নারীহরণ ও পাশবিক অত্যাচারের সমসাময়িক ধারাবাহিক সংবাদের ভিত্তিতে এই কবিতাটি লিখিত। এর ভিতরে অসহায়া নারীদের জন্য দুঃখ এবং শাস্ত্রমানা আস্তিকতার বাহক পঙ্গু জনশক্তির প্রতি ধিক্কারে কবির ভাষা ধৈর্যহীন। এ সব ক্ষেত্রেই, কোনো বিশেষ গণ্ডির বিশেষ আকর্ষণ থেকে নয়, মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারে, দুর্বলের উপর সবলের উৎপীড়নে, অধর্ম অন্যায়ের প্রাবল্যে সত্য, ন্যায় ও শান্তি সৌন্দর্যের বিপর্যয়ে, কবি মানুষ হিসাবেই প্রতিবাদ করেছেন, দুর্গতদের বেদনা নিজের করে তার ভাষা জুগিয়েছেন তাঁর কাব্যে।

'খাপছাড়া' হাসিঠাট্টাভরা হাস্যরসের কাব্য। তার মধ্যে বক্রভাবে ধারালো কথা আছে বটে, কিন্তু বাণী হিসাবে সোজাসুজি সারালো কথা নেই। তবে এখানে এর কথাও উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, ওর বিষয়গত পাত্রপাত্রীগুলি প্রায় সবই সাধারণ লোক। ওর ভিতরে তাদের মজার মজার চরিত্র ও চালচলন, জীবনযাত্রার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য-গুলি ও তাদের কথার রস অনেকটা ধরা পড়েছে।

'ছড়ার ছবি' বা একেবারে শেষের দিকের 'ছড়া' কাব্যও কতকটা ঐ ধরনেরই জিনিস। অবশ্য খাপছাড়ার মতো হাস্যরস 'ছড়ার ছবি'র মুখ্যরস নয়। কিন্তু লৌকিক জীবনের শান্ত রসেই কবির মন এখানে মশগুল। সহজ কথায় অতি সুন্দর প্রাঞ্জল ভঙ্গিতে তার প্রকাশ। কোনো উদ্দেশ্য নেই, নিরাবিল রসসৃষ্টি ছাড়া,—বলা যায় মনোরঞ্জনই এর উদ্দেশ্য। বিশেষ করে ছেলেদের জন্যই লেখা, তাই সাদাসিধে কথাগুলি সোজাসুজি মনে গিয়ে লাগে। এর প্রত্যেকটি গল্প স্বতন্ত্র করে আলোচনার যোগ্য। কত দিক দিয়ে কত রকমে যে দরিদ্র মধ্যবিত্ত এবং নিম্নসাধারণকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন এ বইয়ের কবিতাগুলি তার অন্যতম নিদর্শন। একটি অন্তর্গূঢ় বেদনা এবং আত্মীয়তা এই কবিতাগুলিতে এমন সূক্ষ্মভাবে লেগে রয়েছে যে তার আবেশই পাঠকচিত্তকে সমবেদনায় আকুল করে তোলে। এদের নিয়ে মজা করার মধ্যেও কবির সেই আত্মীয় মনটি অনুভব করা যায়। এক-একটি পংক্তিতেই এক-একটি ছবি আঁকা হয়ে গেছে,—"পিসনি বুড়ি চলেছে গ্রাম ছাড়ি", "একলা হোথায় বসে আছে, কেই বা জানে ওকে", "আকাল পড়ল, দিন চলে না, চলল দেশান্তরে", "অচল বুড়ি মুখখানি তার স্নেহরসে ভরা", "শিউনন্দন দাঁড়াল তার শূন্য ভিটেয় এসে", "যেমনি শোনা অমনি ছুটল. ভোজালি তার হাতে", "মাধোকে এক খাটের খুরোয় বাঁধল কষে জোরে", "ঐ যে গরিব পাড়া,—আর কিছু নেই ঘেঁষাঘেঁষি কয়টা

কুটীর ছাড়া", "পলে পলে পার যারা হয় মাটির 'পরে মাটি, প্রত্যেক পদ হাঁটি"—এই একটি দুটি পংক্তির মধ্যে সাধারণের দুঃখ-দৈন্য-নির্যাতনের কত না মর্মান্তিক কাহিনীর আভাস আছে. আছে আবার তাদেরই কত জীবনযুদ্ধে বীর্যবত্তার ইঙ্গিত। প্রায় কবিতাই এমনি মহত্ত্বে ভরা। অথচ কোথাও একটু রং চড়িয়ে বলার চেষ্টা নেই, বাস্তবের দিক থেকে সম্ভবপরতায় এবং অংকনের দিক থেকে সুসীম সংগতিতে তা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক।

নবীন আগন্তুকের যাত্রাপথ চেয়ে আছে উৎসুক নবযুগ,—'নবজাতক' কাব্যে কবির এই বাণী রয়েছে প্রথমেই; সেই তরুণ বীর এসে রক্ত-প্লাবন, বিদ্বেষ, বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে মিলনতীর্থ রচনা করবে, শান্তির বাঁধ দেবে বেঁধে। কবি চিরদিনই মূলে আশাবাদী এবং আদর্শ-বাদীও। তিনি এক-একসময় বাস্তবের নিদারুণ বিপরীত অবস্থায় ধৈর্য হারিয়ে ফেলার মুখেও তাঁর সেই আশার বাণী ছাড়তে পারেননি.—এই রক্তপঙ্কিল পৃথিবীর কথার মধ্যেই বলছেন,—

জাগে সুন্দর, জাগে নির্মল, জাগে আনন্দময়ী-
জাগে জড়ত্বজয়ী।

এবং তাঁর বাণীর আর-একটি লক্ষণা সেই নিখিলের যোগের কথাও এখানে বর্তমান। বলছেন,—

জাগো সকলের সাথে
আজি এ সুপ্রভাতে
বিশ্বজনের প্রাঙ্গণতলে লহ আপনার স্থান,
তোমার জীবনে সার্থক হোক
নিখিলের আহ্বান॥

বিশ্বব্যাপী ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাত চলছে, কবির কাছে তা আকস্মিক নয়, কারণ—

জমা হয়েছিল আরামের লোভ
দুর্বলতার রাশি,

কবি বলছেন,—
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।

তারপরে ?—

যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণশক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে॥

ভয় নেই,--বেদনা আছে বটে কিন্তু তেমনি ভবিষ্যতের জন্য আশা আনন্দও আছে।
এ বইয়ের 'এপারে-ওপারে' কবিতায় "সর্বব্যাপী সামান্যের স্পর্শের" জন্য কবির মন ব্যগ্র হয়ে জেগে উঠেছে। কিন্তু—

আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।

'রোমান্টিক' কবিতায় বলছেন,—

যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি, সে নহে কথায় তাহা জানি
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা
সেথায় রমণী দস্যুভীতা,
সেথায় উত্তরী ফেলি' পরি বর্ম,
সেথায় নির্মম কর্ম,
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক মাভৈঃ
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে হাতে॥

লোকব্যবহারে যা সামান্য তার প্রতিও দৃষ্টি ছিল কবির জীবনের প্রথম থেকেই, তাই বাস্তবের কেরানি-জীবনের সামান্যতার কথাও "তীব্র ভাষা"য় কবি লিখেছিলেন 'তুমি মোরে করেছ সম্রাট' নামক মর্ত্যপ্রেমের অমর কবিতারই এক অংশে। সেদিন থেকে এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আবো নানাস্থলে নানা কবিতায় সেই তুচ্ছ সামান্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর বাড়তে বাড়তেই চলেছে। ক্রমশই যে তাঁর কাব্যে ভাবাবেগের বাষ্পাবরণ কাটিয়ে কঠিন বাস্তব-লোকজীবনের এই তুচ্ছ দিকের ব্যবহারিক বাণী সত্যের স্পর্শে কেমন তীব্র দীপ্তিমান হয়ে উঠছে, ধারানুসরণে তাও দেখা গেছে।

এখানে 'নবজাতক'এ এসে কবি 'জয়ধ্বনি'তে বলছেন,—

যাবার সময় হলে জীবনের সব কথা সেরে
শেষবাক্যে জয়ধ্বনি দিয়ে যাব মোর অদৃষ্টেরে।
বলে যাব, পরম ক্ষণের আশীর্বাদ
বারবার আনিয়াছে, বিস্ময়ের অপূর্ব আস্বাদ।
যাহা রুগ্ন, যাহা ভগ্ন, যাহা মগ্ন পঙ্কস্তরতলে
আত্মপ্রবঞ্চনাছলে
তাহারে করি না অস্বীকার।

* * * * *

মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,
ছুটিনি করিতে প্রতিকার,
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।

* * * * *

যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষবাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি।

'আরোগ্য' কাব্যের প্রথম কবিতায় জয়ধ্বনির পরেব কথা জেগেছে,—

এ দ্যুলোক মধুময় মধুময় পৃথিবীর ধূলি

* * * * *

সব ক্ষতি মিথ্যা করি' অনন্তের আনন্দ বিরাজে

* * * * *

দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগেব মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।

সব-কিছু মহান উপলব্ধির মধ্যে সামান্যের উপলব্ধিও যে কত অসামান্য হয়ে উঠতে পারে 'আরোগ্য' কাব্যের মধ্যে কবির বাণীতে তারি পরিচয় আছে। এই সামান্যের উপলব্ধির পথেই এখানে ধরণীর ধূলি কবির কাছে দ্যুলোকের মতোই মধুময় হয়ে উঠেছে। এবং এই পথ ধরেই গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে যে-মেঠোপথ নদীর পাড় দিয়ে দিয়ে দূরের দিকে গেছে, সেই পথে গিয়ে পড়েছে কবির মন। প্রাচীন অশথতলা, সেখানে খেয়ার আশায় লোক বসে, পাশে হাটের পশরা, মহাজনের আড়ত, মেছুনি, মাঝিমাল্লা, চাষী—এই সকলের মধ্যে ঘুরছে সেই কবিমন। এই সব উপেক্ষিত ছবিগুলিই জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদ-বেদনা জাগাচ্ছে। বিশেষকে ছেড়ে সর্বগুধু চেতনা নিখিল জনতার মধ্যে নিয়ে গেছে কবিকে। শেষদিকে এই নিজের এবং সমগ্রের কথায় জনতাব কথাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর বাণীর প্রধান লক্ষ্য। "ওরা যারা কাজ" করে খায়, অগণিত সেই জনগণের জীবনযাত্রা, তাদের সুখদুঃখ, তাদের বিভিন্ন সমস্যা থেকে কবির কাব্যে একদিকে যেমন খুলেছে বিশেষ একটি রসের প্রস্রবণ, অন্যদিকে তেমনি উদ্দীপনার আলো। আর, সব ছাপিয়ে জেগেছে এক অনির্বাণ আশা—নূতন যুগ আসবে। আসবে সেই কবি,—

কৃষাণের জীবনের শরিক যেজন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি

—সেই কবির বাণীর জন্য কবি কান পেতে আছেন। তার কাছে কবির কামনা—

ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।

তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি,
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার॥

মহাকবির বিপুল বাণীধারা অনুসরণ করে দেখা যায়. 'লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণী' তাঁর প্রায় প্রতিটি কাব্যেই ধ্বনিত। সে বাণীধারার তিনটি রূপ,—এক নিখিল সামগ্রিক, তারপরে উদার স্বাদেশিক বা স্বাজাতিক, তারপরে শ্রেণীসচেতন জানগণিক। নানাস্থলেই মানুষের ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, লোভ, অন্যায়, অত্যাচার, মেকিত্ব নিয়ে তার উপর ব্যঙ্গবিদ্রূপ, শ্লেষ ও ভর্ৎসনাও আছে; সঙ্গে সঙ্গেই আছে তার মহৎ দিক অর্থাৎ সৌন্দর্য, শক্তি ও সত্যতার দিক দিয়ে তার অভিনন্দন, বন্দনা, আশীর্বাদ ও জয়ধ্বনি।
পূর্বাপর কবির এক দুঃখ যে, তিনি কথাই বলেছেন, কিছু কাজ করে মিলতে পারেননি জনজীবনে। শেষদিকে তাঁর কাছে,—

আজ সব কথা
মনে হয়, শুধু মুখরতা।

যে-কামনা আজ তাঁর মধ্যে জাগছে,—জীবনের শুরুতেই তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল.—সেদিনও বলেছিলেন,—

যাত্রা করি মানবের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি' নিজ দুঃখশোক।

বলেছিলেন,—

মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন;

আর আজ বলছেন,—

বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম

* * * * *

আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর-সংগমে।
এই বাহ্য আবরণ জানি না তো শেষে
নানারূপে রূপান্তরে কালস্রোতে বেড়াবে কি ভেসে।
আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসক্ত দেখিব তারে আমি
বাহিরে বহুর সাথে জড়িত অজানা তীর্থগামী।

কবি আপন স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে আজ "বাহিরে বহুর সাথে" (অর্থাৎ সেদিনকার ভাষায়) "জগতের প্রকাণ্ড জীবনে" মিলন-উন্মুখ। যাত্রামুখে তাঁর—

মন বলে আমি চলিলাম,
রেখে যাই আমার প্রণাম
তাদের উদ্দেশে যারা জীবনের আলো
ফেলেছেন পথে পথে যাহা বারেবারে
সংশয় ঘুচালো।

ক্ষুদ্র একটি কক্ষের মধ্যে হোলে এক পলকেই চোখে পড়ে তার কোথায় কী আছে,—কিন্তু একটা সহস্রদ্বার অট্টালিকার মধ্যে সবই একবারে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় কি? রবীন্দ্র-কাব্যহর্ম্যে তেমনি দৃষ্টিবিভ্রম এবং অন্ধতা জন্মায় ওর দ্রব্যের ও দ্রব্যসংস্থানের বিপুল বৈচিত্র্যে এবং বৃহৎ

ব্যাপকতায়। সমাজের সর্বস্তরের লোকজীবনের কথাই তিনি কিছু-না-কিছু বলে গেছেন, কোথাও বলেছেন তা সৌন্দর্য বা রসসৃষ্টির আগ্রহে, কোথাও বাস্তবতার বেদনাসংঘাতে। তার মধ্যে শুধু বর্ণনা নয়, শুধু ভাবাবেগের খেলা নয়, অবস্থার বাস্তব বর্ণনাও যেমন আছে, তেমনি ব্যবস্থার অর্থাৎ সমস্যা-সমাধানকল্পে সত্যপথনির্দেশক উদ্দীপনা-আলোকেরও সন্ধান মিলবে তাতে। রূপকভাবে বলতে গেলে ব্যাধি, চিকিৎসা, এবং আদর্শ স্বাস্থ্যবান জীবনযাত্রা,—সমাজের সর্ব অবস্থার সর্ববিষয়ক বাণীতেই রবীন্দ্রকাব্য পরিপূর্ণ। এই আলোচনাটির মধ্যেই দেখা যাবে, রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য সর্বদিক লক্ষ্য করেই তার বিকীরণ ঘটেছে। কিন্তু সে বাণী খণ্ড খণ্ড কাব্যাবলীতে বহুস্থলে বিশ্লিষ্ট এবং বহুদূর ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে বলে একবারে একদৃষ্টিতে তার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। তারই থেকে যা লোকাপবাদের সৃষ্টি। কিন্তু সেই অপবাদ অধৈর্য লোকসমাজের দৃষ্টির স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা, সেই সঙ্গে লোকের যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসাবৃত্তির অভাবজনিত অক্ষমতাই মাত্র প্রমাণ করে। কবিকে সেজন্য দায়ী করা অনুচিত শুধু নয়, তাতে মূর্খতারও পরিচয় দেওয়া হয়। বিপুল সেই কাব্যহর্ম্য, তার অসংখ্য মহল, অসংখ্য বিষয়-সম্ভার, জীবনযাত্রার সহস্র কথা-সুর বুকে নিয়ে চিরবিস্ময়ের দৃশ্য হয়ে অপূর্ব দীপ্তিতে স্থির দাঁড়িয়ে আছে মহাকালের পথপার্শ্বটিতে। কত সময় কত বাণীই না তার থেকে নির্গত হয়ে এসে আন্দোলিত করছে পথের জনপ্রবাহকে। লোকবাণীর আলোচনায় আজ সব ধ্বনি ছাপিয়ে লোকজীবনের শেষ বাণীর কথা কয়টিই এসে কানে বাজছে,—

ঐ মহামানব আসে। -

কবির এই শেষ গান মানুষেরই বাণী নিয়ে। এখানে আবার মনে পড়ছে 'পুনশ্চ' কাব্যের সেই 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির কথা। তারও ইঙ্গিত ঐ মানবে। পীর পয়গম্বরদের মতো কবি মানবসমাজকে

দেখাননি সত্যযুগের সোনার স্বপ্ন, শোনাননি কোনো অবতারের আবির্ভাব সম্ভাবনার কথা, আকাশ থেকে আকস্মিক অলৌকিক কোনো দৈবলীলার ভাবী সংঘটনের ভবিষ্যদ্বাণী বিলিয়েও তিনি আকাশ-কুসুমের মোহবিস্তারে সহজ কৌশলে মুগ্ধ করেননি জনমন। তাঁর অতি স্বাভাবিক সাদা কথা,—"আর কেউ নয়, মানুষই আনবে মানুষের মুক্তি।" যদি কোথাও সে মানুষের আবির্ভাব আশা করতে হয়, আশার সেই স্থল, আকাশে বাতাসে, বনে, মন্দিরে, গুহাগহ্বরে নয়,—তার আবির্ভাব হবে মানবী মায়ের কোলে,—এবং সে মা যে উচ্চবর্ণ, উচ্চ শিক্ষা, বা উচ্চ ঘরেরই বিশিষ্টা কেউ হবেন তাও নয়,—তিনি উচ্চ হতে পারেন, মধ্য হতে পারেন, নিম্নও হতে পারেন। উচ্চ মধ্য নিম্ন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দীন, দেশ, জাতি, শ্রেণী, ধর্ম—সব নিয়ে যে নিখিল জনতার মানুষ,—সেই সাধারণ মানুষেরই একজনা সেই মা, আর, সাধারণেরই একজনা সেই জাতক যিনি আনবেন মানবের মুক্তি, হবেন একদিন মহামানব। অসাধারণ, অলৌকিক দৈব কিছুই সে নয়। যুগে যুগে নূতন সৃষ্টি এনেছে জগতে এই মাটিরই মানুষ,—প্রলয়ও ঘটিয়েছে এই মানুষই। তারই মহৎ কীর্তি মহৎ চরিত্র থেকে দেখা দিয়েছে দেবতার স্বপ্ন, তারই অপকীর্তি ও দুর্বৃত্ততা থেকে জেগেছে দানবের বিভীষিকা। দেবদানব সবই হচ্ছে মানুষের মনোজগতের ধারণার ব্যাপার। আসলে বাস্তব হচ্ছে মানুষকে নিয়ে। সুতরাং শেষ গানে কবি বাস্তবেরই জয়গান করেছেন। লোকজীবনের ব্যবহারিক দিক থেকে এর মতো জনগণের আশার বাণী, গৌরবের বাণী ও আনন্দের বাণী আর কী থাকতে পারে!

আজ যারা নিতান্ত অনাড়ম্বরে অচিহ্নিত সাধারণ শিশুবেশে ঘরে ঘরে জন্ম নিচ্ছে, তাদেরই মধ্যে কেউ আছে আগামী যুগের মানব-নায়ক। একদিন সে-ই চালাবে পৃথিবীকে নূতন সৃষ্টির পথে। পূর্ববর্তী

কাব্য 'বীথিকা'য় এই মানুষের 'অভ্যুদয়' যেন আকাশে বাতাসে কবি অনুভব করছেন,—

শত শত লোক চলে
শত শত পথে
তারি মাঝে কোথা কোন্ রথে
সে আসিছে যার আজি নব অভ্যুদয়।
দিকলক্ষ্মী গাহিল না জয়;
*   *   *   *   *
সে কি নিজে জানে
আসিছে সে কী লাগিয়া
আসে কোন্‌খানে।
যুগের প্রচ্ছন্ন আশা করিছে রচনা
তার অভ্যর্থনা
কোন্ ভবিষ্যতে;

তারপরে 'নবজাতক' কাব্যে এই মানুষকে উদ্দেশ করেই বলছেন,

কে বলিতে পারে তোমার ললাটে শিখা
কোন্ সাধনার অদৃশ্য জয়টীকা।
আজিকে তোমার অলিখিত নাম
আমরা বেড়াই খুঁজি
আগামী প্রাতের শুকতারা সম
নেপথ্যে আছে বুঝি।
মানবের শিশু বারেবারে আনে
চিব আশ্বাসবাণী
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝিবা দিতেছে আনি।

'শেষলেখা' কাব্যখানি থেকে বোঝা যায়, মানুষের মুক্তিদূত এই মহামানবের আগমন সত্যদ্রষ্টা কবির উপলব্ধির মধ্যে একবারে যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে,—মহামানবের গানে তিনি বলে উঠেছেন,—

উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয়রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে॥

রবীন্দ্রকাব্যের লোকবাণীর শেষ ইঙ্গিত,—

মানুষই মানুষের মুক্তি আনবে।

রবীন্দ্র প্রবন্ধ-সাহিত্যে লোকসমাজ

কাব্য, নাটক, সংগীত, গল্প, উপন্যাস,—বাণীর নানা ধারায় রবীন্দ্রনাথ মানুষের কথা বলেছেন সত্যি, কিন্তু আরো একটি ক্ষেত্রে তিনি মানুষের কথা ভেবেছেন আরো বেশি করে, সে হচ্ছে তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যে। তাঁর প্রবন্ধগুলি শুধু কল্পনাকে ভিত্তি করে নয়, প্রায় সবেরই উৎপত্তি স্বদেশের ও বিশ্বের বাস্তব ঘটনা উপলক্ষ্য করে। কিন্তু চিন্তার উৎকর্ষে ও রচনার গুণে তা সাময়িক হয়ে কালের গর্ভে তলিয়ে যায়নি, চিরকালের উপভোগ্য ও প্রেরণাস্থল হয়ে প্রকৃত সাহিত্যের কোঠায় বিরাজ করছে। বালক, সাধনা, ভারতী, বঙ্গদর্শন, ভাণ্ডার, তত্ত্ববোধিনী ও শান্তিনিকেতন পত্রিকা প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক বা পরিচালক হিসেবে কবির নখদর্পণে থাকত সমগ্র দেশের চলতি অবস্থার খবরাখবর। তারপরে একরকম সারা জীবনই তিনি আরো অনেক পত্রিকার সংস্রবে ছিলেন, কারো উপদেষ্টা, কারো প্রোৎসাহক, কারো পরোক্ষ সম্পাদক হয়ে। এইদিক দিয়ে প্রবাসী, সবুজপত্র, বিচিত্রা, পরিচয় প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকাগুলি তাঁর অনেক চিন্তাধারা প্রকাশের গৌরবে ধন্য হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধ-

সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করে দেখলে বিস্ময় লাগে যে, দেশ তাঁকে কতটুকু জানে, আর তিনি দেশকে কতখানি জানতেন! রচনাগুলি পড়লেই বোঝা যায় সেগুলি কেবল পত্রিকার পাতা ভরিয়ে সাহিত্যিক বা স্বাদেশিক নেতা হিসেবে নাম কেনবার জন্য বা রচনা করবার জন্যই রচনা করা নয়। এক-একটা ঘটনায় মনে তীব্র আঘাত পেয়ে দেশের মানুষদের দুর্গতি থেকে মুক্ত করবার জন্য তিনি যেন দেশব্যাপী অজ্ঞানতা, কৃত্রিমতা ও সর্বপ্রকার নীচতা দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। আবার মনের উদ্বোধনে উৎসাহের নতুন প্রেরণার সন্ধানও দিয়েছেন নিজের চিন্তা থেকে তো বটেই, দেশবিদেশের মনের খনি থেকেও চিন্তারত্ন সংগ্রহ করে। কালে কালে তার বাস্তবতা ও উপযোগিতা যাচাই হবে নানা মানুষের নানা সমস্যার ক্ষেত্রে। দেশের মানুষের কথা তিনি কত গভীর এবং আন্তরিকভাবে ভেবে গেছেন এবং তাঁর সেই আজীবন চিন্তার কাজ কত বিস্তৃত ক্ষেত্রে রেখে গেছেন, সে পরিচয় নিয়ে তাঁকে আমরা আপনার ভেবে ভালোই বাসি বা কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পূজা দিই, লেখাগুলি পড়ে দেখলে বুঝব, আমাদের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন সামান্যই, আমরা তাঁব কাছ থেকে লোকসমাজ-গঠনের সুচিন্তিত পথের হদিস্ পেয়ে লাভবান হয়েছি অনেক বেশি।

সমাজের ভালো মন্দ দু'দিক নিয়ে নবীন ও প্রবীণের প্রেরণা ও বিবেচনামূলক আলোচনায় 'চিঠিপত্র' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি দেশের কথার সূত্রপাত করেছে।

'পঞ্চভূতে' পাঁচজনের আলোচনা; তাও সমাজ, সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের কথা জড়িয়ে।

পরবর্তী 'আত্মশক্তি' গ্রন্থে প্রথমেই প্রশ্ন রয়েছে "নেশন কী?" ফরাসী ভাবুক 'রেনাঁ'র চিন্তা এনে উপহার দিয়েছেন বঙ্গীয় পাঠককে। "রেনাঁ বলেন,—"মানুষ জাতির, ভাষার, ধর্মমতের বা নদী পর্বতের দাস

নহে। অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্ত হৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘ যে একটি সচেতন চরিত্র সৃজন করে, তাহাই নেশন। সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিবিশেষের ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা এই চারিত্রচিত্র যতক্ষণ নিজের বল সপ্রমাণ করে, ততক্ষণ তাহাকে সাঁচ্চা বলিয়া জানা যায় এবং ততক্ষণ তাহার টিঁকিয়া থাকিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।" রেনাঁর এই উক্তিকে দেশের প্রতি প্রয়োগ করে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন।

এই বইয়ে 'ভারতবর্ষীয় সমাজ'কে হিন্দুসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কবি বলছেন,—"সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পদদান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম, ইহাতেই আমাদের মঙ্গল,—ইহাকে বাণিজ্য হিসাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর-কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত কর্মযোগ, এই কথা নিয়ত স্মরণ করা ইহাই হিন্দুত্ব। সমাজের নীচে হইতে উপর পর্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণে বাঁধা, ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড়ো চেষ্টার বিষয়। রাজনীতিক চেষ্টায় যে কোনো ফল নাই, তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা আমাদের সামাজিক ঐক্যসাধনে কিয়দ্দূর সহায়তা করিতে পারে, ইহাই তাহার প্রধান গৌরব।" এখানে দেখা যাচ্ছে, রাজনীতিক চর্চার চেয়ে সমাজের কল্যাণ-চেষ্টাই কবির লক্ষ্য। রাজনীতি তখন পরমুখাপেক্ষী, কিন্তু সমাজের কাজ নিজেদেরই উদ্যম সাপেক্ষ, পরের অপেক্ষায় না থেকে নিজেদের স্বাধীন চেষ্টায় যা করা যায় সেই শ্রেয়, এই মনোভাবই স্বাধীনতার মূল প্রেরণা। কবি মনে-প্রাণে স্বাধীনতাকামী, তাই স্বাধীন ফরাসী জাতির ভাবুক রেনাঁর চিন্তা তাঁকে আকর্ষণ করেছে।

বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের মন্তব্য প্রকাশিত হবার পর লেখা হয় তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ। পরপ্রত্যাশী

মনোভাবের প্রতি মুখবন্ধেই তার হুল,—"'সুজলা সুফলা' বঙ্গভূমি তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে,—কিন্তু সে চাতক পক্ষীর মতো ঊর্ধ্বের দিকে তাকাইয়া আছে—কর্তৃপক্ষীয়েরা জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই।

"আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু...সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

"দেশে এই যে সমস্ত লোকহিতকর মঙ্গলকর্ম ও আনন্দ উৎসব এতকাল অব্যাহতভাবে সমস্ত ধনী দরিদ্রকে ধন্য করিয়া আসিয়াছে, এজন্য কি চাঁদার খাতা কুক্ষিগত করিয়া উৎসাহী লোকদিগকে দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইয়াছে, না, রাজপুরুষদিগকে সুদীর্ঘ মন্তব্যসহ পরোয়ানা বাহির করিতে হইয়াছে? নিঃশ্বাস লইতে যেমন আমাদের কাহাকেও হাতে-পায়ে ধরিতে হয় না, রক্তচলাচলের জন্য যেমন টৌন হল-মিটিং অনাবশ্যক—সমাজের সমস্ত অত্যাবশ্যক হিতকর ব্যাপার সমাজে তেমনি অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া আসিয়াছে।" এবং কবির মতে চিরদিনই এমনটি ঘটা দরকার। দেশকে তিনি অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস ও আচার ইত্যাদি থেকে যেমন জেনেছেন, উদ্ধৃতাংশেব মধ্যে সংক্ষেপে তারই সার পরিচয় মিলবে। এ সম্বন্ধে চিরজীবন তিনি স্বাধীন ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার নির্দেশ দিয়াছেন, তার কথাও ঐ উদ্ধৃতাংশেই স্পষ্ট ব্যক্ত আছে।

বৈষয়িক স্বার্থের ক্ষেত্রে সমউদ্দেশ্যে দেশকে সংঘবদ্ধ করা পলিটিক্যাল সাধনার মূল লক্ষ্য। কিন্তু "আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী"। তাদের মিলবারও একটি ক্ষেত্র আছে, সে তাদের নিজস্ব প্রণালীতেই গড়া, সে মিলনক্ষেত্রটি হচ্ছে 'মেলা'। "ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব স্থাপন করেন—কোনোপ্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া, বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচরভূমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।"

"গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গল সম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।

"এই উচ্চভাব হইতেই আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রাত্যহিক সম্বন্ধ কি বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব?"

ভারতবর্ষে দেশকে সংঘবদ্ধ করার বিশিষ্ট উপায়টি কী? কোন্‌খানে কী উপলক্ষ্য নিয়ে সে মিলতে পারে? কবির মতে আমাদের দেশে মেলাই হচ্ছে গণসংযোগের পথ।

লক্ষ্য করবার বিষয়, প্রথম থেকেই কবির চিন্তা যেমন স্বদেশমুখী তেমনি বিশ্বমুখী, এবং দুটিতে কোনো বিরোধ তো নেইই বরং একটি আর-একটির সহায়ক। আর সেই চিন্তায় ক্ষুদ্রদেরও বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।

কবি বলছেন, "স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব—তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম। এইবার সময় আসিয়াছে, যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে, যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি—আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।"

এখানে অবশ্য কবি তাঁর পরিকল্পিত সমাজে তথাকথিত 'তালিকাভুক্ত' ক্ষুদ্রজাতির জন্য আজকালকার মতো 'রক্ষাকবচে'র দোহাই পাড়েননি। তিনি আবেদন করেছেন লোকের হৃদয়সম্বন্ধের কাছে, যেটা ন্যায়-ধর্মেরই অঙ্গ। কিন্তু এ যুগে সেই মানবীয় ন্যায়ধর্মের প্রভাবের উপর বিশ্বাস করা যায় কি? কবি অবাস্তব নন, তিনি সম্ভবপরতার কথা মনে রেখে পরক্ষণেই বলেছেন, "তর্ক এই উঠিতে পারে যে, ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা খুব বড়ো জায়গা ব্যাপ্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে না। একটা ছোটো পল্লীকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি,—কিন্তু পরিধি বিস্তীর্ণ করিলেই কলের দরকার হয়—দেশকে আমরা কখনোই পল্লীর মতো করিয়া দেখিতে পারি না—এইজন্য অব্যবহিতভাবে দেশের কাজ করা যায় না, কলের সাহায্যে করিতে হয়।...

"কথাটা অসংগত নহে। কল পাতিতেই হইবে। এবং কলের নিয়ম যে-দেশী হউক না কেন তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই ব্যর্থ হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে, শুধু কলে ভারতবর্ষ চলিবে না—যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব না করিব, সেখানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না।"

রাষ্ট্রক্ষেত্রে এখন আছেন কংগ্রেসের সভাপতি, 'স্বদেশী সমাজে'ও কবি সমাজের একজন নায়ক চেয়েছিলেন। "স্বদেশকে একটি বিশেষ

ব্যক্তির মধ্যে উপলব্ধি করিতে চাই।...পূর্বে যখন রাষ্ট্র সমাজের সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল, তখন রাজারই এই পদ ছিল। এখন রাজা সমাজের বাহিরে যাওয়াতে সমাজ শীর্ষহীন হইয়াছে।...এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদসভা থাকিবে, কিন্তু তিনিই প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।"... "এই সমাজপতি কখনো ভালো, কখনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না।...ইঁহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত হইবেন। সমাজের সমস্ত অভাব মোচন, মঙ্গল কর্মচালনা ও ব্যবস্থারক্ষা ইঁহারা করিবেন এবং সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।"..."অবশ্য, এখন আমি কেবল বাংলাদেশকেই আমার চোখের সামনে রাখিয়াছি। এখানে সমাজের অধিনায়ক স্থির করিয়া আমাদের সামাজিক স্বাধীনতাকে যদি আমরা উজ্জ্বল ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগও আমাদের অনুবর্তী হইবে। এবং এইরূপে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ যদি নিজের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ঐক্য লাভ করিতে পারে, তবে পরস্পরের সহযোগিতা করা প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়।"...

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ থেকে এতদিন পরে স্বাধীন স্বদেশী শাসনব্যবস্থা পত্তন হবার মুখে, কবির সেই প্রাদেশিক স্বরাজের ভিত্তিতেই নিখিল ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন-কাঠামো দাঁড় করাবার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু যাই হোক, এখানে দেখবার বিষয়,—কবি বাংলাদেশকে সামনে দেখছেন বলে প্রাদেশিকতার গণ্ডিতে তাঁর দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়ে ওঠেনি। তিনি সব সময়েই ভারতের আপাত-বিভেদের খণ্ডতা পেরিয়ে তার সম্ভাব্য মহান ঐক্যরূপটি দেখে এসেছেন। বলছেন,—

"বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—ইহাই ভারত-বর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না—সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।

"ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীস্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে।

"আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃ-নির্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি, তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে—ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে, তাহার সন্ধান পাইব।"

"স্বদেশী সমাজে" কবি সমাজকে সুগঠিত করবার একটি পরিকল্পনা দেশবাসীর সামনে এই প্রথম উপস্থিত করেছেন। দেশকে এই পরিকল্পনা দিয়ে তিনি বসলেন এসে শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্রে। ওদিকে কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রেরণা ও পরিকল্পনার পরোক্ষ প্রভাবও দেখা দিল ধীরে ধীরে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশে পাশে গড়ে উঠল গঠনমূলক কাজের ধারা। কংগ্রেস-কমিটিগুলিই প্রায় "স্বদেশী সমাজের" ছাঁচে গড়ে উঠল। তারও মূল কথা হল, স্বাধীন চেষ্টায় অশন বসন, স্বাধীন চেষ্টায় সমাজ নিয়ন্ত্রণ, এবং জাতি, ধর্ম, শ্রেণী ও প্রাদেশিকতার ঘৃণাবিদ্বেষ ঘুচিয়ে দেশময় সমস্ত লোকে মিলেমিশে সমাজের উন্নতি সাধন করা। এই ঐক্য ও স্বাবলম্বনের শক্তি থেকেই স্বরাজ আসবে জনগণের হাতে।

এ-বইয়ের নানা প্রবন্ধে কবি সমাজ-উন্নতির নানা দিক নিয়ে বিশদ-ভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষাই হচ্ছে লোকসমাজ-গঠনের প্রধান উপায়। এর পরেই চিন্তা গেছে তাঁর সেই দিকে। শিক্ষার দিক নিয়ে "সফলতার সদুপায়" রচিত। শহরে এবং ভদ্রপল্লীতে প্রাথমিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে, কৃষিপল্লীগুলিতেও ঠিক সেই ধরনের ব্যবস্থা অনুপযুক্ত। অথচ এ সম্পর্কে গভর্নমেণ্টের এক বেয়াড়া স্কীম চালু হবার উপক্রম হয়। কবি তখন তার সমালোচনায় ঐ প্রবন্ধে বলেন, "দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।"
শিক্ষাক্ষেত্রেও আজ দেশময় গণ-সংযোগের কথা উঠেছে। সুদূর অতীতে এ কাজের কথাটিও কবি বলে গিয়েছেন। কিন্তু 'কবির কথা' বলেই হয়তো এতদিন তা মাঠে মারা না গেলেও তারই সামিল হয়ে পুঁথির পাতায় আছে পড়ে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভ্যর্থনা করবার জন্য "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ" কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক সভায় ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে কবি বলেন, "কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগস্থাপন করিতে হইবে। বাস্তবিকতা বিবর্জিত হইলে আমাদের মনই বল, হৃদয়ই বল, কল্পনাই বল, কৃশ এবং বিকৃত হইয়া যায়। অতএব একথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষ বস্তুর সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম,—ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আপনার আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন।...বাংলা ভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্য পরিষদের একটি প্রধান কাজ।...আমাদের ছাত্রগণ সমবেত-ভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না। বাংলায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে স্থানে

স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে।...মানব-সাধারণের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে—পরিষদের অধিনায়কতায় যদি ছাত্রগণ স্ব স্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-সমস্ত সম্প্রদায় আছে, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা, তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।...আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ 'এথ্‌নোলজি'র বই যে পড়ি না, তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি ডোম, কৈবর্ত বাগ্‌দি রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কত বড় মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব, তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি।...আমাদের ছাত্রগণ যদি তাহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি...সামাজিকপ্রথা . গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান, বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে।...ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই বীণা বাজাইতেছেন, একথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র,—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানা-পুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহা রোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভান্ডারের দিকে হতাশদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ঠ-

বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরানিগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্ধাশনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।...সাহিত্য পরিষদে আমরা দেশকে জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি—দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায় পল্লীর কৃষিকুটীরে পরিষৎ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন,...যদি পারো, তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী এই সকল মাতৃসেবকের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো।"

দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার খর্ব ও ব্যয়বহুল করার জন্য "য়ুনিভার্সিটি বিল" লর্ড কর্জনের আমলে তৈরি করা হয়, তার প্রতিবাদে কবি লেখেন "য়ুনিভার্সিটি বিল" প্রবন্ধ। তাতে কবি বলছেন—"দেশে বিচার দুর্মূল্য, অন্ন দুর্মূল্য, শিক্ষাও যদি দুর্মূল্য হয়, তবে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিচ্ছেদ আমাদের দেশেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিবে।"

সমাজ-ব্যবস্থায় দেশবাসীর মধ্যে অতীতে কি রকম হৃদ্য সম্বন্ধ ছিল তার একটি চিত্র এঁকে কবি বলছেন, "আমাদের দেশে দরিদ্রের মধ্যে মনুষ্যত্ব ছিল, কারণ আমাদের সমাজে সুখ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-আমোদ মোটের উপরে সকলে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। ধনীর চণ্ডীমণ্ডপে যে পাঠশালা বসিয়াছে, গরিবের ছেলেরা বিনাবেতনে তাহাতে শিক্ষা পাইয়াছে—রাজার সভায় যে উৎসব হইয়াছে, দরিদ্র প্রজা বিনা আহ্বানে তাহাতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ধনীর বাগানে দরিদ্র প্রত্যহ পূজার ফুল তুলিয়াছে, কেহ তাহাকে পুলিশে দেয় নাই, সম্পন্ন ব্যক্তি

দিঘিঝিল কাটাইয়া তাহার চারিদিকে পাহারা বসাইয়া রাখে নাই। ইহাতে দারিদ্রের আত্মসম্ভ্রম ছিল—ধনীর ঐশ্বর্যে তাহার স্বাভাবিক দাবি ছিল, এইজন্য, তাহার অবস্থা যেমনই হোক, সে পাশবতা প্রাপ্ত হয় নাই—যাঁহারা জাতিভেদ ও মনুষ্যত্বের উচ্চ অধিকার লইয়া মুখস্থ বুলি আওড়ান, তাঁহারা এসব কথা ভালো করিয়া চিন্তা করিয়া দেখেন না।...এখন সমাজের সহিত বিদ্যার পরস্পর সহায়তার যোগ নাই। ইহাতে এতকাল পরে শিক্ষাসাধনব্যাপার ভারতবর্ষে রাজার প্রসাদ-অপেক্ষী হইয়াছে।...এস্থলে আমাদের একমাত্র কর্তব্য, নিজেরা সচেষ্ট হওয়া ·.. জ্ঞানশিখাকে স্বদেশের জিনিস করিয়া দাঁড় করানো।" হ'য়েও ছিল তাই; দেশে স্বাধীন চেষ্টায় 'ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন' বা 'জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ' নামক প্রতিষ্ঠান তখন আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবে, "অবস্থা ও ব্যবস্থা" প্রবন্ধে, সাময়িক উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত না হয়ে দেশবাসীকে কবি আসল সমস্যাটির কথা ভাবতে বলেছেন এবং ভাবিয়েছেন। "যথাসম্ভব বিলাতি জিনিস কেনা বন্ধ করে দেশী জিনিস কেনবার" উদ্‌যোগটির সম্বন্ধে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন—ইংরেজের ক্ষতি বা দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হবে ব'লে নয়, সকলে মিলে নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দেশের দিকে তাকিয়ে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ও আরামের অভ্যাস কিছু পরিমাণে পরিত্যাগ ক'রে সেই ত্যাগের ঐক্য দ্বারা পরস্পর নিকটবর্তী হয়ে দেশকে বলিষ্ঠ করা যাবে, একথা ভেবেই। স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে দেশের সর্বকর্মব্যবস্থার জন্য তিনি এই প্রবন্ধে পঞ্চায়েত-প্রথা প্রবর্তনের জন্য একটি প্রস্তাব করেন। তার সমর্থনে রুশিয় গভর্ন-মেণ্টের অধীন বাহ্যিক প্রদেশীয় একটি বিবরণীর নজির উদ্ধৃত করেন। বলেন, "অতএব আর দ্বিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে। সরকারী পঞ্চায়েতের মুষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্বেই

আমাদের নিজের পল্লীপঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চাষীকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং সর্বনেশে মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে,—কারণ, এস্থলে সাহায্য লইবার অর্থই দুর্বলের স্বাধীন অধিকারের মধ্যে প্রবলকে ডাকিয়া আনিয়া বসানো।" জাতীয় চেতনা অভ্যুদয়ের প্রথম উষাকালে কবি সর্ব-সাধারণেরই যোগে যে-সমাজ-ব্যবস্থার পথনির্দেশ করে গেছেন, ভেবে দেখবার বিষয় যে, আজ এই জনজাগরণের কর্মকোলাহলের দিনে প্রেরণায় বা চিন্তায় কোন্‌দিকে কতটুকু আমরা তার থেকে বেশি এগিয়েছি।

কবি কর্তৃক জনচিন্তার ক্ষেত্রে রাশিয়ার এই নামোল্লেখ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এখন আমরা একরকম উঠতে-বসতে রাশিয়ার নাম করি, কিন্তু তখনকার দিনে প্রকৃত মর্যাদা দিয়ে ক'জন লোক রাশিয়াকে এমন ক'রে কাজের ক্ষেত্রে স্মরণ করেছে? তখন কাজের লোক ছিল কম, স্বাদেশিকতা তখন ভাবাবেগমুখী, নামমাত্র কাজ এবং তারো বেশি উত্তেজনা, উদ্বেগ, ও তর্ক-বিচারেই দেশসেবা সীমাবদ্ধ ছিল, আর অভাব ছিল—গঠনমূলক স্থায়ী কাজের জন্য এক-মতাবলম্বী লোকের। এই পরিস্থিতিতে কবি ক্রমাগতই দেশকে স্থায়ী কাজের তাগিদ দিয়েছেন, কেবল প্রেরণা নয়, বিচার-বিবেচনার যুক্তি পরামর্শ নয়, দিয়েছেন পরিকল্পনা এবং বলেছেন,—"এখন আর বাদবিবাদ তর্ক-বিতর্ক না করিয়া আমরা যে-কয়জনেই উৎসাহ অনুভব করি, প্রয়োজন স্বীকার করি, সেই পাঁচদশজনেই মিলিয়া আমরা আপনাদের অধিনায়ক নির্বাচন করিব, তাঁহার নিয়োগক্রমে জীবনযাত্রা নিয়মিত করিব,. কর্তব্য পালন করিব, এবং সাধ্যমতে আপনার পরিবার,

প্রতিবেশী ও পল্লীকে লইয়া সুখ-স্বাস্থ্য-শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে একটি স্বকীয় শাসনজাল বিস্তার করিব। এই প্রত্যেক দলের নিজের পাঠশালা. পুস্তকালয়, ব্যায়ামাগার, ব্যবহার্য দ্রব্যাদির বিক্রয়-ভাণ্ডার (কো-অপারেটিভ স্টোর) ঔষধালয়. সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক, সালিশ-নিষ্পত্তির সভা ও নির্দোষ আমোদের মিলন-গৃহ থাকিবে।

"এমনি করিয়া যদি আপাতত খণ্ডখণ্ড ভাবে দেশেব নানাস্থানে এইরূপ এক-একটি কর্তৃসভা স্থাপিত হইতে থাকে, তবে ক্রমে একদিন এই সমস্ত খণ্ড সভাগুলিকে যোগসূত্রে এক করিয়া তুলিয়া একটি বিশ্ববঙ্গ প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।"

সেদিনকার এই পরিকল্পনার সঙ্গে আজকের তফাৎ শুধু এইটুকু যে, শুধু বিশ্ববঙ্গই নয়, আজ বিশ্ববঙ্গের পরিবর্তে স্বাধীন নিখিল ভারত-প্রতিনিধিসভা নিয়েই চলেছে দেশের রাষ্ট্রচেষ্টা।

কবির প্রবন্ধের উল্লিখিত অংশে স্বদেশী শাসনের যে একটি কাঠামো দেওয়া আছে, কবির "রাশিয়াব চিঠি"তে পরবর্তীকালে তাঁর প্রত্যক্ষীভূত গণতন্ত্রী আদর্শ-দেশ রাশিয়ার পৌরজীবনের ছবিব সাদৃশ্যই কি তাতে আভাসিত হয়নি?

পুরুষের মতো নাবীরাও সমাজের পক্ষে অপরিহার্য। তারা কোনো-ক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। তাদের নিজেদেরও উদাসীন হয়ে শুধু ঘবকন্নাব কাজেই লিপ্ত থাকলে চলবে না, জাতিগঠনে তাদের প্রেরণা ও কর্মশক্তিও অপরিহার্য। কবি তাই দেশের কাজে নারীদেরও যোগ দেবার আহ্বান জানিয়েছেন 'ব্রতধারণ' প্রবন্ধে। সমাজের তখনকার পরিস্থিতিতে তাদের বিশেষ কর্তব্য. কবির মতে,—বিলাতীবর্জন ও "দেশের জিনিসকে বক্ষা করা"।

স্বাধীন চেষ্টা বা আত্মশক্তিবিকাশের ক্ষেত্র হচ্ছে স্বদেশ, কিন্তু সে এলাকা যখন বিদেশী বা পরকর্তৃত্বের অন্তর্গত, সেখানে আত্মশক্তির পূর্ণ ও সহজ প্রকাশ নানা কারণে বাধাগ্রস্ত,—কিন্তু কবির আকাঙ্ক্ষা মনে

মনে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই অবাধ প্রকাশ,—সেই ব্যাকুলতাই নিয়ে গেছে তাঁর চিন্তাকে 'দেশীয় রাজ্যে'। "দেশীয় রাজ্যের ভুলত্রুটি-মন্দগতির মধ্যেও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে, তাহা বস্তুতই আমাদের নিজেদের লাভ।...এইখানেই স্বদেশের যথার্থ স্বরূপকে আমরা দেখিতে চাই।...ব্রিটিশরাজ আমাদের উন্নতি চান, কিন্তু সে উন্নতি ব্রিটিশমতে হওয়া চাই।...কিন্তু দেশীয় রাজ্যে স্বভাবের অব্যাহত নিয়মে দেশ উন্নতিলাভের উপায় নির্ধারণ করিবে, ইহাই আমাদের কামনা।...দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের কান্তি এখানে যেন মাতৃকক্ষে আশ্রয়লাভ করে এবং দেশের শক্তি মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মতো আপনাকে অতি সহজে অতি সুন্দর-ভাবে প্রকাশ করিতে পারে।"

এর পরবর্তী গ্রন্থ 'ভারতবর্ষ' তাতে বঙ্গদেশ থেকে, স্বদেশের গণ্ডি এবং সেই সঙ্গে চিন্তার প্রসার সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয়েছে। সব আলোচনাতেই ভারতের কথা। কবি এ বইটিতে ইউরোপের তুলনা-মূলক আলোচনা দ্বারা স্বদেশের পরিচয়কে আরো পরিষ্কার ও গভীরতর করে তুলেছেন,—দুই ভূভাগের লোকপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য থেকে তাদের দুইয়ের কর্মপ্রণালীর বিশিষ্টতার পরিচয়ে বলছেন, "ইউরোপ ভোগে একাকী, কর্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে একাকী। ইউরোপের ধনসম্পদ, আরামসুখ নিজের—কিন্তু তাহার দানধ্যান, স্কুল-কলেজ, ধর্মচর্চা, বাণিজ্যব্যবসায়, সমস্ত দল বাঁধিয়া। আমাদের সুখসম্পত্তি একলার নহে আমাদের দান ধ্যান অধ্যাপন, আমাদের কর্তব্য একলার।"

অর্থ ও শিল্পচেষ্টার নীতি সম্পর্কে কবির মত : "বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রকাণ্ড মূলধন এক জায়গায় মস্ত করিয়া উঠাইয়া তাহার আওতায় ছোটো ছোটো সামর্থ্যগুলিকে বলপূর্বক নিষ্ফল করিয়া তোলা

শ্রেয়স্কর বোধ করি না।" ভারতবাসীর অন্নবস্ত্রের সমাধানে মহাত্মা গান্ধীর কুটীরশিল্পের পথে চরকার বাণীর পূর্বাভাস হিসাবে কবির এই কথা দূরদর্শিতার পরিচায়ক নয় কি?

ইউরোপের কলকারখানাবাহিত কর্মপদ্ধতি মানুষের যা দুর্দশা ঘটিয়েছে, ধনী এবং দরিদ্র—মানুষের এই দুই স্তর থেকেই কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন,—"এই সকল কৃষ্ণধূমশ্বসিত দানবীয় কারখানাগুলোর ভিতরে বাহিরে চারিদিকে মানুষগুলোকে যেভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে তাহাদের নির্জনত্বের সহজ অধিকার, একাকিত্বের আব্রুটুকু, থাকে না। না থাকে স্থানের অবকাশ, না থাকে কালের অবকাশ, না থাকে ধ্যানের অবকাশ। এইরূপে নিজের সঙ্গে নিজের কাছে অত্যন্ত অনভ্যস্ত হইয়া পড়াতে, কাজের একটু ফাঁক হইলেই মদ খাইয়া প্রমোদে মাতিয়া বলপূর্বক নিজের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা ঘটে। নীরব থাকিবার, স্তব্ধ থাকিবার, আনন্দে থাকিবার সাধ্য আর কাহারও থাকে না।

"যাহারা শ্রমজীবী তাহাদের এই দশা। যাহারা ভোগী, তাহারা ভোগেব নব নব উত্তেজনায় ক্লান্ত। নিমন্ত্রণ, খেলা, নৃত্য, ঘোড়দৌড়, শিকাব ভ্রমণের ঝড়ের মুখে শুষ্কপত্রের মতো দিনরাত্রি তাহারা নিজেকে আবর্তিত করিয়া বেড়ায়। ঘূর্ণাগতির মধ্যে কেহ কখনো নিজেকে এবং জগৎকে ঠিকভাবে দেখিতে পায় না, সমস্তই অত্যন্ত ঝাপসা দেখে। যদি একমুহূর্তের জন্য তাহার প্রমোদচক্র থামিয়া যায়, তবে সেই ক্ষণকালেব জন্য নিজের সহিত সাক্ষাৎকাব, বৃহৎ জগতের সহিত মিলনলাভ, তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।"

যেখানে ইউরোপেই এই অবস্থা, সেখানে ভাবতবর্ষের অবস্থা যে কী, তাও জানার বিষয়। পাশাপাশি সে চিত্রও দেওয়া আছে,—"ভারতবর্ষ ভোগের নিবিড়তাকে আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীর মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া লঘু করিয়া দিয়াছে, এবং কর্মের জটিলতাকেও সরল করিয়া আনিযা

মানুষে-মানুষে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। ইহাতে ভোগে, কর্মে, ধ্যানে প্রত্যেকেরই মনুষ্যত্ব চর্চার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। ব্যবসায়ী—সেও মন দিয়া কথকতা শোনে, ক্রিয়াকর্ম করে; শিল্পী—সেও সুর করিয়া রামায়ণ পড়ে।...ভারতবর্ষ ছোটোবড়ো, স্ত্রীপুরুষ সকলকেই মর্যাদাদান করিয়াছে। এবং সে মর্যাদাকে দুরাকাঙ্ক্ষার দ্বারা লভ্য করে নাই। বিদেশীরা বাহির হইতে ইহা দেখিতে পায় না। যে-ব্যক্তি পৈত্রিক কর্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে-কর্ম যাহার পক্ষে সুলভতম তাহা পালনেই তাহার গৌরব—তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলেই তাহার অমর্যাদা। এই মর্যাদা মনুষ্যত্বকে ধারণ করিয়া রাখিবার একমাত্র উপায়। পৃথিবীতে অবস্থার অসাম্য থাকিবেই, উচ্চ অবস্থা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে—বাকি সকলেই যদি অবস্থাপন্ন লোকের সহিত ভাগ্য তুলনা করিয়া মনে মনে অমর্যাদা অনুভব করে, তবে তাহারা আপন দীনতায় যথার্থই ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। বিলাতের শ্রমজীবী প্রাণপণে কাজ করে বটে, কিন্তু সেই কাজে তাহাকে মর্যাদার আবরণ দেয় না। সে নিজের কাছে হীন বলিয়া যথার্থই হীন হইয়া পড়ে। এইরূপে ইউরোপের পনেরো আনা লোক দীনতায়, ঈর্ষায়, ব্যর্থ প্রয়াসে অস্থির। ইউরোপীয় ভ্রমণকারী, নিজেদের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীয়দের হিসাবে আমাদের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীয়দের বিচার করে,— ভাবে, তাহাদের দুঃখ ও অপমান ইহাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু তাহা একেবারেই নাই। ভারতবর্ষে কর্মবিভেদ শ্রেণীবিভেদ সুনির্দিষ্ট বলিয়াই, উচ্চশ্রেণীয়েরা নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য নিম্নশ্রেণীকে লাঞ্ছিত করিয়া বহিষ্কৃত করে না। ব্রাহ্মণের ছেলেরও বাগদি দাদা আছে। গণ্ডিটুকু অবিতর্কে রক্ষিত হয় বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে যাতায়াত, মানুষে-মানুষে হৃদয়ের সম্বন্ধ বাধাহীন হইয়া উঠে—বড়োদের আত্মীয়তার ভার ছোটোদের হাড়গোড় একেবারে পিষিয়া ফেলে না। পৃথিবীতে যদি ছোটোবড়োর অসাম্য অবশ্যম্ভাবীই হয়, যদি স্বভাবতই সর্বত্রই সকল প্রকার ছোটোর সংখ্যাই অধিক ও বড়োর সংখ্যাই স্বল্প

হয়, তবে সমাজের এই অধিকাংশকেই অমর্যাদার লজ্জা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষ যে উপায় বাহির করিয়াছে, তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে।"

মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে যুক্ত হয়ে এক সমাজে থাকতেই হবে। সমাজ গড়ে উঠেছে এইভাবেই।

সমাজব্যবস্থার দোষগুণে এক-এক দেশের সমাজের মধ্যে মানুষের দুঃখ বা সুখ বাড়ে কমে। জীবনযাত্রায় সমস্ত মানুষ যাতে অন্তত মোটামুটি সুখস্বাচ্ছন্দ্যটুকুও পেতে পারে এই প্রচেষ্টায় রাশিয়া সব দেশের চেয়ে বেশি এগিয়েছে। প্রত্যেকের স্বাধীন মর্যাদাবান অধিকারের ভিত্তিতে এই সমাজতন্ত্রের দৃষ্টি ও চেষ্টা যত আন্তরিকভাবে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছে এমন আর কোনো দেশে নয়। এটাই আজ দুনিয়ার সব লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতবর্ষের নিজস্ব সমাজ-ব্যবস্থায় সর্ব মানুষের উন্নতির প্রতি সে দৃষ্টি ও চেষ্টা কতখানি ছিল, আধুনিককালের মানদণ্ড রাশিয়ার নীতির পাশাপাশি তার উপরি-উদ্ধৃত পরিচয়টিও আমাদের জানা দরকার।

কর্মের প্রয়োজনে মিলনের নীতি নিয়েছে ইউরোপ, ভারতবর্ষ চেয়েছে আত্মীয় সম্বন্ধে মিলতে। ভারতের সমাজব্যবস্থা ও তার বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপঘেঁষা মনকে ঘরের দিকে টেনেছেন 'নববর্ষ' প্রবন্ধে।

'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে বলছেন,—"ফরাসী-বিদ্রোহ গায়ের জোরে মানবের সমস্ত পার্থক্য রক্ত দিয়া মুছিয়া ফেলিবে, এমন স্পর্ধা করিয়াছিল—কিন্তু ফল উল্টা হইয়াছে—ইউরোপের রাজশক্তি, প্রজাশক্তি, ধনশক্তি, জনশক্তি ক্রমেই অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল সকলকেই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা, কিন্তু তাহার উপায় ছিল স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়া সমাজ-কলেবরকে এক এবং বিচিত্র কর্মের

উপযোগী করিয়াছিল—নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধ বিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া রাখিতে দেয় নাই।"
এই তো গেল নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থার কথা, কিন্তু ভারতে তো অপর আরো বৈদেশিক জাতির সমাবেশ ঘটেছে, তাদের সম্বন্ধে ভারতের নীতি কী? সেই সমস্যায় কবির বাণী,—"পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল. ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। বিদেশী যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে, ভারতবর্ষ তাহাকে দেখিয়া ভীত হয় নাই. নাসা কুঞ্চিত করে নাই। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে—তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ কবে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।
"এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্ম-নীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান. প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।"
এর পবে এ প্রবন্ধে যে অনুচ্ছেদটি আছে, তাতে বিশ্বের মধ্যে ভারত-বর্ষেব আদর্শের বিশেষ সার্থকতার দিকটি নির্দেশ করা হয়েছে। "পৃথিবীব সভ্যসমাজেব মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শ-রূপে বিরাজ কবিতেছে. তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধাবিপত্তি দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভাবতবর্ষ ইহাই

করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ লুপ্ত হইবে।

"বিদেশের শিক্ষা ভারতবর্ষকে অতীতে ও বর্তমানে দ্বিধা বিভক্ত করিতেছে। যিনি সেতু নির্মাণ করিবেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" ভারতবর্ষের এই "নানাকে এক করিবার আদর্শকে"ই তিনি পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত ক'রে বাহির বিশ্বকে ঘরে এনে মিলিয়েছেন। এইভাবে ভারতের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতু নির্মাণের কাজ করে আমাদের রক্ষার সূচনাও তিনিই করে গেছেন।

যেমন দেশের আভ্যন্তরিক গঠন পরিকল্পনার কাজ করছে কংগ্রেস, বিশ্বভারতীতে তেমনি চলছে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ; আজকের চলমান এই দুটি কাজেরই মূলে রয়েছে রবীন্দ্র-নাথের প্রেরণা ও পরিকল্পনা। এই দুটি প্রতিষ্ঠানই সর্বমানবিক প্রতিষ্ঠান। ছোটোবড়ো নির্বিশেষে সকলেরই সাংসারিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ সাধন এদের লক্ষ্য। মুখ্যত লোকজীবনযাত্রার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিবিধানের কাজ নিয়ে আছে কংগ্রেস, আর জ্ঞানের বিস্তারে মন ও প্রাণের মুক্তিতে জীবনে পরম আনন্দবিধানের কাজ নিয়ে আছে বিশ্বভারতী। প্রত্যেক জাতি ও মানুষের জীবনের এই দুইদিকের উন্নতির উপরেই মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ভর করে। মানুষের বাহির ও অন্তর--উভয়েরই উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন যে গভীরভাবে চিন্তা করে এসেছেন, উপরোক্ত প্রবন্ধগুলিতে তার বিশদ পরিচয় মেলে। এর মধ্যে আদর্শের ব্যাখ্যানও আছে, আবার হাতেকলমে কাজের কথাও আছে; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ সম্পর্কে যত কথা কবি বলেছেন,—তার প্রায় সব কথারই সূচনা দেখা যাবে প্রথম জীবনে লেখা তাঁর এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে।

এইসব প্রবন্ধে বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের কথা কতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে কবি উল্লেখ করেছেন তা সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। কিন্তু উচ্চনীচ বলে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে মানুষের খণ্ড অনুভবের ধারা রবীন্দ্রনাথের নয়, শিক্ষায় দীক্ষায় অনুভবে আলোচনায় তপশীলভুক্ত ক'রে কাউকে আংশিক সত্তায় না দেখে, সর্বত্রই জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষকে অখণ্ড বিশ্বমানবের অঙ্গ বলে ধরে বিশ্বের সর্ব অধিকারে প্রতি মানুষের অনন্ত সম্ভাবনার কথাই তিনি বিশ্বাস করে গেছেন। তবে একথা ঠিক, উচ্চ হোক নীচ হোক, সকলের পক্ষেই শক্তির অধিকাব উপযুক্ত সাধনাসাপেক্ষ। সে অধিকার কুলগত হোতে পারে কিন্তু একান্তই জন্মগত নয়, দৈব তো নয়ই। এই সাধনাতে উচ্চনীচ সকলেই সকলকে সাহায্য করবে আত্মীয়তার সঙ্গে; পৃথকভাবে নয় সম্মিলিতভাবে,—সর্বজনের এই মিলিত সাধনাই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবসভ্যতার আদর্শ। সে সভ্যতার চালকও আসবে মানুষের মধ্য থেকেই—স্বর্গের দেবতামণ্ডল থেকে নয়। স্বদেশের সভ্যতার মধ্যেই তিনি তাঁর এই বিশ্বমানবিকতার আদর্শ পেয়েছেন। 'ভারতবর্ষ' বইয়েব সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, রাষ্ট্র, শিক্ষা ও শিল্প সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে পৃথিবীর আর-দশটা দেশের তুলনামূলক আলোচনায় সে আদর্শের বৈশিষ্ট্য আরো পরিস্ফুট হয়েছে 'চীনেম্যানের চিঠি,' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা' নামক প্রবন্ধ দুটিতে। এবং সবচেয়ে সুন্দরভাবে এই সর্বমানবিক অনুভূতিটি ভাষা-রূপ ধরে প্রকাশ পেযেছে সর্বমানবের অখণ্ড ঐক্যসত্তাবূপী ভুবনেশ্ববের মন্দির-গাত্রের শিল্পবাণী-ব্যাখ্যায়। 'মন্দির' নামে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর মন্দির বিষযক প্রবন্ধটির শেষ অনুচ্ছেদে কবি লিখছেন, "কিন্তু এই একের সহিত একের সংযোগ ভুবনেশ্বরের মন্দিরে লিখিত নহে। সেখানে সমস্ত মানুষ তাহার সমস্ত কর্ম সমস্ত ভোগ লইয়া, তাহার তুচ্ছ বৃহৎ সমস্ত ইতিহাস বহন করিয়া, সমগ্রভাবে এক হইয়া আপনাব মাঝখানে অন্তরতর রূপে,

সুন্দররূপে, সাক্ষিরূপে, ভগবানকে প্রকাশ করিতেছে—নির্জনে নহে, যোগে নহে—সজনে কর্মের মধ্যে। তাহা সংসারকে, লোকালয়কে দেবালয় করিয়া ব্যক্ত করিয়াছে—তাহা সমষ্টিরূপে মানবকে দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়াছে। তাহা প্রথমত ছোটোবড়ো সমগ্র মানবকে আপনার প্রস্তরপটে এক করিয়া সাজাইয়াছে, তাহার পর দেখাইয়াছে, পরম ঐক্যটি কোন্‌খানে, তিনি কে। এই ভূমা ঐক্যের অন্তরতর আবির্ভাবে প্রত্যেক মানব সমগ্র মানবের সহিত মিলিত হইয়া মহীয়ান। পিতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, পুরুষের সহিত স্ত্রী, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, এক জাতির সহিত অন্য জাতি, এক কালের সহিত অন্য কাল, এক ইতিহাসের সহিত অন্য ইতিহাস দেবতাত্মা দ্বারা একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে।"

কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায়, দেশে একদিন কবি-বর্ণিত সর্বমানবমুখী আদর্শ সমাজব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দেশ পরাধীনতায় ডুবল কেন?-- এমনিতে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বুঝিবা দেশের পরাধীনতাকে বিশেষ কিছু ভাববার বিষয় বা সেদিকে মানুষের কিছু করণীয় আছে ব'লে গণ্য করেননি। একথা নেহাত মিথ্যা নয় যে, তিনি তাঁর কার্যসূচীতে রাষ্ট্রকে গৌণ ক'রে সমাজকেই করেছেন মুখ্য। কিন্তু রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর চেতনা বা উদ্যমের অভাবই এর কারণ নয়; মনে রাখা দরকার স্বদেশী-যুগে "বাংলার মাটি বাংলার জল" প্রভৃতি জাতীয় সংগীত রচনা, রাখীবন্ধন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের উদ্‌যোগ, জাতীয় মহাসভাব নেতৃত্ব এবং আরো নানা ব্যাপারে তিনি ছিলেন নব্যভারতের আদি রাষ্ট্রিক মুক্তি-অভিযানের পুরোভাগে। কিন্তু তখন থেকেই বহুবিস্তৃত বহুবিচিত্র ভারতভূমি তাঁর কাছে এক নতুন রূপে নতুন তাৎপর্যে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। সে রূপ হচ্ছে ভারতের সর্বমানবিক রূপ, সে তাৎপর্য হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত 'নানাকে এক করার' তাৎপর্য। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি তখন গাইলেন,—

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

ভারতে বহুর সমাবেশ ঘটেছে এখানকার লোক দুর্বল, ভীরু, অসমর্থ বলে নয়—কারণ, এখানকার ক্ষত্রিয়, শিখ, মারাঠা ইত্যাদি জাতির ইতিহাস তো মানুষের সে নিকৃষ্ট পরিচয় বহন করে না,—তবে?—এতবড় একটা দেশ প্রায় একটা মহাদেশেরই সমান, তার নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা মতামত, রীতিনীতি, কার্যকলাপ নিয়ে সকলের মধ্যে প্রদেশে প্রদেশে যোগাযোগ রক্ষা করা চিরকালই সুকঠিন প্রমাণিত হয়েছে, যেমন তখন তেমনি এখনো। এইজন্যই শিথিল শর্তবিচ্ছিন্ন ভারত বৈদেশিক আক্রমণের সময়ে সংগ্রামক্ষেত্রে সকল প্রদেশের সকল জাতির যুক্তশক্তির মহড়া নিতে পারেনি। এক স্বার্থে মিলনের পথে বাধা জন্মিয়েছিল এরই বহুতা এবং বিচিত্রতা। ভারতের জাতীয় জীবনে এ এক অভিশাপ। আর, তারই সুযোগে বৈদেশিকদের আক্রমণ ঘটেছে বারে বারে। কিন্তু তা বলে কবির দৃষ্টিতে এই বৈদেশিকরা হিংসা বা বিদ্বেষের পাত্র হয়নি কোনোদিন। কবি সব দেশের সব মানুষকেই এক নিখিল বিশ্বমানবসত্তার অংশ হিসেবে দেখেছেন। তারা তাদের কর্মের বলে এবং এদেশের অনৈক্যের সুযোগ নিয়েও যদি এদেশে এসে থাকে, তবুও তারা তো সেই নিখিল লোকসমাজেরই মানুষ। এদেশে এসে এদেশকে যদি তারা আপন বলে গ্রহণ করে থাকে, এদেশের মানুষকে যদি জীবনে গ্রহণ করে থাকে আত্মীয়ভাবে, তবে তারা তো তখন এদেশেরই লোক। বিশ্বপ্রেমের পূজারি রবীন্দ্রনাথ কী করে তাদের সেই মানুষের আত্মীয়-অধিকার থেকে দূর করবেন বা দূরে রাখবেন! দায়ে পড়ে বা অক্ষম বলে নয়,—আদর্শের দিক থেকে, উপলব্ধি থেকেই কবি ভারতের বুকে নানা জাতির অভিযান ও তাদের বসবাসকে অভিনন্দিত করেছেন হৃদয় খুলে। এককালে যে বিশাল-ক্ষেত্রটি বিশ্বের সকল

মানুষের মিলনভূমি হবে, সে তাঁর ধ্যানের পুণ্যতীর্থ এই ভারতবর্ষ। তার পরাধীনতাকে তিনি তখনই মাত্র প্রকৃত পরাধীনতা বলে জেনেছেন, যখন বাইরের লোক ঘরে এসে এদেশকে পর করেই রেখেছে, এদেশের লোককে করেছে ঘৃণা। শেষজীবনে এই উপলব্ধি ঘটেছিল কাদের নিয়ে তা আজ সর্বজনবিদিত। পরাধীনতার গ্লানি ও বেদনায় অগ্নিস্রাবী তাঁর শেষ ভাষণ "সভ্যতার সংকট"।

কিন্তু বরাবরই কবি ভারতের রাষ্ট্রিক পরাধীনতার চেয়ে মানুষের সামাজিক দুর্গতির জন্যই মর্মবেদনা জানিয়েছেন বেশি, তারই প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন তাঁর কাজে তাঁর লেখায়। রাষ্ট্রীয় দুর্গতির চেয়ে মানুষের এই নৈতিক দুর্গতিই তাঁকে বেশি বিচলিত করেছে। রাষ্ট্রীয় উন্নতির দিক চেয়ে নীতির অবনতি ঘটালে তাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই ঘটবে বেশি। কবির প্রধান আশঙ্কাই সেইখানে। আর প্রকৃতপক্ষে আজ যারা বিদেশী, সেই ইংরেজের অধীনতায় ইদানীং দেশের এই নৈতিক দুর্গতি ঘটেছে।

বিষয়স্বার্থের সংঘবদ্ধতা নিয়ে ইউরোপে প্রধান চর্চার বিষয় রাষ্ট্রতন্ত্র, আর, নীতিশৃঙ্খলায় সংঘবদ্ধতা নিয়ে ভারতে সামাজিকতার প্রসার। বিষয়স্বার্থে ভারতবর্ষ এক হোতে পারেনি, কিন্তু এদেশে নীতি-শৃঙ্খলায় সমাজ মানুষকে বেঁধেছিল সর্বত্র সম পাপপুণ্যবোধে ও ন্যায়াচরণের চেষ্টায়। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন,—"আমাদের দেশের সমাজতন্ত্র একটি সুবৃহৎ ব্যাপার। ইহাই সমস্ত দেশকে নিয়মিত করিয়া ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই বিশাল লোকসম্প্রদায়কে অপরাধ হইতে স্খলন হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। যদি এরূপ না হইত, তবে ইংরেজ তাহার পুলিশ ফৌজের দ্বারা এত বড়ো দেশে এমন আশ্চর্য শান্তিস্থাপন করিতে পারিতেন না। নবাব-বাদশাহের আমলেও নানা রাজকীয় অশান্তি সত্ত্বেও সামাজিক শান্তি চলিয়া আসিতেছিল—তখনো লোক-

ব্যবহাব শিথিল হয নাই, আদান-প্রদানে সততা বক্ষিত হইত, মিথ্যা সাক্ষ্য নিন্দিত হইত, ঋণী উত্তমর্ণকে ফাঁকি দিত না এবং সাধাবণ ধর্মেব বিধানগুলিকে সকলে সবল বিশ্বাসে সম্মান কবিত।

'সেই বৃহৎ সমাজেব আদর্শ বক্ষা কবিবাব ও বিধিবিধান স্মবণ কবাইযা দিবাব ভাব ব্রাহ্মণেব উপব ছিল। ব্রাহ্মণ এই সমাজেব চালক ও ব্যবস্থাপক। এই কার্যসাধনেব উপযোগী সম্মানও তাঁহাব ছিল। কোনো সম্মান বিনামূল্যেব নহে—যথেচ্ছ কাজ কবিযা বাখা যায না। যে বাজা সিংহাসনে বসেন, তিনি দোকান খুলিযা ব্যবসা চালাইতে পাবেন না। আমাদেব আধুনিক ব্রাহ্মণেবা বিনামূল্যে সম্মান আদাযেব বৃত্তি অবলম্বন কবিযাছিলেন। তাহাতে তাঁহাদেব সম্মান আমাদেব সমাজে উত্তবোত্তব মৌখিক হইযা আসিযাছে। কেবল তাহাই নয, ব্রাহ্মণেবা সমাজেব যে উচ্চকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, সে-কর্মে শৈথিল্য ঘটাতে সমাজেবও সন্ধিবন্ধন প্রতিদিন বিশ্লিষ্ট হইযা আসিতেছে।

যদি প্রাচ্য ভাবেই আমাদেব দেশে সমাজবক্ষা কবিতে হয, যদি ইউবোপীয প্রণালীতে এই বহুদিনেব বৃহৎ সমাজকে আমূল পবিবর্তন কবা সম্ভবপব বা বাঞ্ছনীয না হয, তবে যথার্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদাযেব একান্ত প্রযোজন আছে। তাহাবা দবিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন ধর্মনিষ্ঠ হইবেন সর্বপ্রকাব আশ্রমধর্মেব আদর্শ ও আশ্রযস্বরূপ হইবেন ও গুবু হইবেন।

যে সমাজেব একদল ধনমানকে অবহেলা কবিতে জানেন, বিলাসকে ঘৃণা কবেন, যাহাদেব আচাব নির্মল, ধর্মনিষ্ঠা দৃঢ, যাঁহাবা নিঃস্বার্থ-ভাবে জ্ঞান বিতবণে বত—পবাধীনতা বা দাবিদ্র্যে সে সমাজেব কোনো অবমাননা নাই।

ইউবোপীয সমাজ যে-নিযমে চলে, তাহাতে গতিজনিত বিশেষ একটা ঝোঁকেব মুখেই অধিকাংশ লোককে ঠেলিযা দেয। সেখানে বুদ্ধিজীবী লোকেরা বাষ্ট্রীয ব্যাপাবেই ঝুঁকিযা পড়ে—সাধাবণ লোকে

অর্থোপার্জনেই ভিড় করে। বর্তমানকালে সাম্রাজ্যলোলুপতা সকলকে গ্রাস করিয়াছে এবং জগৎ জুড়িয়া লঙ্কাভাগ চলিতেছে।

"এই ঝোঁকের উপরেই সমস্ত কর্তৃত্ব না দিয়া সংযত সুশৃঙ্খল কর্তব্য-বিধানের উপরে কর্তৃত্বভার দেওয়াই ভারতবর্ষীয় সমাজপ্রণালী। সমাজ যদি সজীব থাকে, বাহিরের আঘাতের দ্বারা অভিভূত হইয়া না পড়ে, তবে এই প্রণালী অনুসারে সকল সময়েই সমাজে সামঞ্জস্য থাকে—একদিকে হঠাৎ হুড়ামুড়ি পড়িয়া অন্যদিকে শূন্য হইয়া যায় না। সকলেই আপন আদর্শ রক্ষা করে এবং আপন কাজ করিয়া গৌরব বোধ করে।"

কবির কাম্য লোকসমাজব্যবস্থার মোটামুটি পরিচয় উদ্ধৃতাংশের মধ্যে পাওয়া যায়, ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী ঝোঁকের কথাও প্রসঙ্গত এসে গেছে। আজো ভারত সমাজশৃঙ্খলাহীন দারিদ্র্যের মাঝেই একরকম ডুবে আছে, আর ইউরোপ আছে তার সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মধ্যে কবিবাঞ্ছিত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অভ্যুত্থান এখনো হয়নি, তাই ঐ দারিদ্র্য ও পরাধীনতার লজ্জা আজো আমাদের এড়াবার উপায় নেই। তবে কবির আদর্শ একেবারে বিফল হয়নি—যে আদর্শ-মানুষের চিত্র তিনি 'ব্রাহ্মণে' এঁকে গেছেন, সেই আদর্শ মতোই সর্বভারতে একদল শিক্ষিত ত্যাগী দেশকর্মীর আবির্ভাব ঘটেছে দেখতে পাই,—সব লজ্জা ও দুর্গতির মধ্যে তাঁদের নিয়েই আমাদের যেটুকু গৌরব। ধনমানকে অবহেলা করে বিলাসকে ঘৃণা করে, ধর্মনিষ্ঠায় দৃঢ় থেকে নিঃস্বার্থভাবে তাঁরা জনচেতনা জাগরণের ও জনসেবার কাজে রত। তবে তাঁদের অধিকাংশেরই দেখা মিলবে রাষ্ট্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে কারণ তাঁরা মনে করেন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই আগে, সমাজব্যবস্থা তার পর। তাঁদের বিশ্বাস, রাষ্ট্রীয় অধীনতাই ভেঙেছে সমাজশৃঙ্খলা; তার থেকেই দারিদ্র্য, তার থেকেই কবি-উল্লিখিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবলুপ্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্য সমস্ত শ্রেণীরও অবনতি। কবির প্রবন্ধে

সেই অবনতির কাবণস্বরূপ, পবাধীনতার ইঙ্গিত যে না রয়েছে তা নয়, রয়েছে—"বাহিবেব আঘাতে অভিভূত হইয়া পড়া" শব্দ কয়টির মধ্যে। তাই বাহিবেব আঘাত দ্বারা অভিভূত না হবাব ব্যবস্থাও একান্তভাবে দরকাব। সেইজন্যই চাই স্বাধীনতা, চাই বাষ্ট্রীয সংঘশক্তিব স্থায়ী উদ্বোধন। নৈতিক ভিত্তিতে শুধু একটি প্রদেশ বা সমাজেব বিশেষ একটি শ্রেণীব মানুষেব আদর্শমতো গডে উঠলে হবে না। সব প্রদেশেব এবং সমাজেব সর্বশ্রেণীব উন্নতি থেকে একই সঙ্গে সমগ্র ভাবতেব নৈতিক, সামাজিক এবং বিষযস্বার্থগত বাষ্ট্রীয ঐক্য ও উন্নতি হওয়া চাই। এ বিষযে কবিব পূর্বোল্লিখিত 'স্বদেশীসমাজ' প্রবন্ধে যে নিখিল ভাবতেব স্বাযত্তশাসনব্যবস্থাব একটি খসডা উপস্থাপিত কবা হযেছে, স্বাধীন ভাবতেব দেশবাসীব পক্ষে সেটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কবিব দুটি পবিকল্পনা কার্যে পবিণত হবাব যোগ্য। তাব প্রথমটি হচ্ছে, নৈতিক ভিত্তিতে সমাজেব আত্মগঠন দ্বিতীয—সেই আত্মগঠনেব ভিত্তিতে সমাজেব সর্বশ্রেণীব সংযোগ। এই সংযোগ সার্থক হবে শাসনব্যবস্থাপক নিখিল ভাবত কেন্দ্রীয প্রতিনিধিসভাব পবিচালনায, আব তা থেকেই হবে ভাবতেব অপবাজেয বাষ্ট্রীয শক্তিব বিকাশ। সেই শক্তিই বাষ্ট্রীয স্বাধীনতাব জন্মদাতা ও বক্ষাকর্তা।

কিন্তু মূলে নৈতিক ভিত্তি না থাকলে সভ্যতা অবিচাবী বাষ্ট্রস্বার্থসর্বস্ব হযে জগতেব লোকসমাজেব পক্ষে কী সাংঘাতিক ক্ষতিকাবক হ'তে পাবে 'যাত্রী গ্রন্থে কবি সে সম্বন্ধে বলছেন—"সিদ্ধি, যাকে ইংবেজিতে বলে সাকসেস, তাব বাহন যত দৌডে চলে ততই ফল পায। ইউবোপেব দেশে দেশে বাষ্ট্রনীতিব যুদ্ধনীতিব বাণিজ্যনীতিব তুমুল ঘোডদৌড় চলছে জলে স্থলে আকাশে। সেখানে বাহ্য প্রযোজনেব গবজ অত্যন্ত বেশি হযে উঠল তাই মনুষ্যত্বেব ডাক শুনে কেউ সবুব কবতে পাবছে না। বীভৎস সর্বভুক পেটুকতাব উদ্যোগে পলিটিক্স্ নিযত ব্যস্ত। তাব গাঁটকাটা ব্যবসাযেব পবিধি পৃথিবীময ছডিযে পডেছে। পূর্বকালে

যুদ্ধবিগ্রহের পদ্ধতিতে ধর্মযুদ্ধ যেখানে মাঝে মাঝে বাধা খাড়া করে রেখেছিল—ডিপ্লম্যাসী সেখানে আজ লাফমারা 'হার্ডল রেস' খেলে চলেছে। সবুর সয় না যে। বিষবায়ুবাণ যুদ্ধের অস্ত্ররূপে যখন একপক্ষ ব্যবহার করলে তখন অন্য পক্ষ ধর্মের দোহাই পাড়লে। আজ সকল পক্ষই বিষের সন্ধানে উঠে পড়ে লেগেছে। যুদ্ধকালে নিরস্ত্র পুরবাসীদের প্রতি আকাশ থেকে অগ্নিবাণ বর্ষণ নিয়ে প্রথমে শোনা গেল ধর্মবুদ্ধির নিন্দাবাণী। আজ দেখি ধার্মিকেরা স্বয়ং সামান্য কারণে পল্লীবাসীদের প্রতি কথায় কথায় পাপ বজ্রবর্ষণ করলে। গত যুদ্ধের সময় শত্রুর সম্বন্ধে নানা উপায়ে সজ্ঞানে সচেষ্টভাবে সত্যগোপন ও মিথ্যাপ্রচারের শয়তানী অস্ত্র ব্যবহার প্রচণ্ডভাবে চলল। যুদ্ধ থেমেছে, কিন্তু সেই শয়তানী আজো থামেনি। এমন কি, অক্ষম ভারতবর্ষকেও প্রবলের প্রপাগান্ডা রেয়াত করে না। এইসব নীতি হচ্ছে সবুর-না-করা নীতি—এরা হল পাপের দ্রুত চাল, এরা প্রতিপদেই বাহিরে জিতছে বটে কিন্তু সে জিৎ অন্তরের মানুষকে হারিয়ে দিয়ে। মানুষ আজ নিজের মাথা থেকে জয়মাল্য খুলে নিয়ে কলের গলায় পরিয়ে দিলে। রসাতল থেকে দানব বলছে—'বাহবা'।"

এই চিত্রে মানবের দানব হয়ে উঠবার আর বাকি কী? যেটুকু ছিল, পূরণ করেছে বর্তমান যুদ্ধ, তার শেষ অস্ত্র আণবিক বোমার ব্যবহারকৌশলে। ন্যায়ধর্মের ভিত্তিতে লোকসমাজ গড়ে না উঠলে এর চেয়েও বেশি করে চলবে দানবীয়তার পাল্লা, যতক্ষণ না পৃথিবী যায় রসাতলে।

মানুষকে বাঁচাতে পারে কবি-নির্দেশিত সর্বমানবিক লোকসমাজ। শুধু তার একটা দিক উন্নত হোলে আংশিক উন্নতি হবে। সে উন্নতির বিপদ আছে। পূর্বোল্লিখিত 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধেই কবি সমাজে শুধু ব্রাহ্মণেরই উন্নতির অসার্থকতা সম্বন্ধে বলেছেন,—"এক পায়ে দাঁড়াইয়া সমাজ বকবৃত্তি করিতে পারে না। দীর্ঘকাল হইতে ভারতবর্ষ আপন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সমাজকে আহ্বান করিতেছে। ইউরোপের কর্মিগণ

কর্মজালে জড়িত হইয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতির কোনো পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, সে নানাদিকে নানা আঘাত করিতেছে—ভারতবর্ষে যাঁহারা ক্ষাত্রব্রত বৈশ্যব্রত গ্রহণ করিবার অধিকারী, আজ তাঁহারা ধর্মের দ্বারা কর্মকে জগতে গৌরবান্বিত করুন—তাঁহারা প্রবৃত্তির অনুরোধে নহে, ধর্মের অনুরোধেই অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত ফলকামনায় একান্ত আসক্ত না হইয়া প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হউন। নতুবা ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শূদ্র, সমাজ প্রত্যহ ক্ষুদ্র এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য, যাহা অটল পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় দৃঢ় ছিল, তাহা দূরস্মৃত ইতিহাসের দিক্‌প্রান্তে মেঘের ন্যায় কুহেলিকার ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে এবং কর্মক্লান্ত একটি বৃহৎ কেরানী-সম্প্রদায় এক পাটি বৃহৎ পাদুকা প্রাণপণে আকর্ষণ করিয়া ক্ষুদ্র কৃষ্ণ-পিপীলিকাশ্রেণীর মতো মৃত্তিকা-তলবর্তী বিবরের অভিমুখে ধাবিত হওয়াকেই জীবনযাত্রানির্বাহের একমাত্র পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করিবে।”

এখানে জানিয়ে রাখা ভালো, 'ব্রাহ্মণ' বলতে শুধু উপবীতধারী হিন্দু ব্রাহ্মণকেই কবি বোঝাতে চাননি। এটি একটি পারিভাষিক শব্দ হিসাবেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ—বিদ্যাবুদ্ধি ও সদাচার-সম্পন্ন এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়। সে সম্প্রদায় সর্বধর্মে এবং সর্বদেশে, সর্বজাতিতেই আছে এবং থাকবে। যে দেশে যে জাতিতে তা নেই সে দেশ সে জাতি কখনো বড়ো হোতে পারে না। সর্বত্রই এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র শ্রেণী চিরদিনই থাকবে, তবে সে শ্রেণীবিভেদ ভারতে যেমন জন্মগত, অন্যত্র তা এ আকারে নেই বটে, কিন্তু কর্ম বা বৃত্তিগতভাবে আছে।

সে ভেদকে আমরা যতই দূর করতে ইচ্ছা বা চেষ্টা করি, তা যুগে যুগে থাকবেই, এই ভেদ থাকাটাকে কেউ বাধা দিয়ে বন্ধ করতে পারবে না। এখানে ক্ষত্রিয় বলতে তাঁদেরই বোঝাচ্ছে যাঁরা দেশরক্ষা ক'রে থাকেন, বৈশ্য তাঁরা, যাঁরা দেশের ধনসম্পদকে কৃষিবাণিজ্যাদি দ্বারা বাড়ান, এবং

শূদ্র তাঁরা যাঁরা সেবা করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা গেছে, ক্ষত্রিয় পতিত হয়েছে, ব্রাহ্মণও অস্পৃশ্য হয়েছে এবং শূদ্রও হয়েছে রাজা। ব্রাহ্মণ ইত্যাদি শব্দগুলি কবি কেবল গুণবাচক অর্থেই ব্যবহার করেছেন। সুতরাং রাষ্ট্রব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা মনে করছেন হিন্দুদের থেকে পৃথক না হোলে দেশের উন্নতি করা অসম্ভব, তাঁরা যেন মনে না করেন রবীন্দ্রনাথ একটা হিন্দু প্রোগ্রামই মাত্র এক সময়ে দেশকে দিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের প্রচলিত সমাজ-কাঠামো এবং প্রচলিত শব্দগুলিকে আশ্রয় ক'রে তিনি নিখিলবিশ্ব লোকসমাজ গঠনের এই প্রোগ্রামটি বিশ্বমানবকে দিয়ে গেছেন; সুতরাং কোনো সম্প্রদায় বা জাতিরই একে সংকীর্ণ স্বার্থে ভাববার কিংবা ব্যাখ্যা করবার বা ব্যবহার করবার কোনো কারণ নেই।

কবি তাঁর আপন জন্মভূমি ভারতবর্ষকে লক্ষ্য ক'রে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শ্রেণী ধ'রে কথাগুলি বললেও সাধারণভাবে বিশ্বের সমগ্র লোকসমাজ সম্পর্কেই কথাগুলি প্রযোজ্য। আলোচনার স্থানসীমা ও সূত্রগুলিকে বাড়িয়ে নিয়ে বৃহত্তর দেশকালপাত্রে প্রয়োগ ক'রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় যে, ভাবতীয় আদর্শ নীতিজ্ঞানসম্পন্ন, কর্তব্য-দৃঢ় কর্মানুগ শ্রেণীবিভক্ত এক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রবদ্ধ সমাজই মানুষের উন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। পারস্পরিক সহযোগে সর্বশ্রেণীর উন্নতি-বিধান দ্বারা প্রদেশে প্রদেশে সেই নীতিশৃঙ্খলিত স্বায়ত্তশাসিত সমাজকে কেন্দ্রীয় একটি সার্বজনিক সংঘশক্তির সঙ্গে যোগযুক্ত রেখে চললে বরাবর সে স্বাধীনভাবে মুক্ত আবহাওয়ায় আপন বিশিষ্ট পরিণতির নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হোতে পারবে। ভারতের মতো স্থানিক পরিবেশ অনুসারে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এদেশীয় ছাঁচে সমাজ তৈরি হবে, এবং তারাও নিখিল লোকসমাজের আন্তর্জাতিক একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় যুক্ত হয়ে অবিরোধে মানবের সাধনাকে সার্থক করে তুলবে।

রবীন্দ্র প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রারম্ভ অংশের দুটি গ্রন্থেই প্রধানত এই আলোচনাটি সীমাবদ্ধ। একটি তার 'আত্মশক্তি', অন্যটি 'ভারতবর্ষ'। তার থেকে কবিচিন্তার মূল কথাটিরই সন্ধান চলেছে,—এর মধ্য থেকে যে-কথাটি আমাদের প্রতিপাদ্য, তা হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই বলে এসেছেন,—ভারতবর্ষের মুক্তি রয়েছে আত্মশক্তির বিকাশে। ভারতবর্ষের সমাজ বিধান হচ্ছে মানুষের আদর্শ সমাজ-বিধান। এই সমাজ আবার স্বাধীন সমুন্নত হয়ে বিশ্বলোক-সমাজের আদর্শ হোক। এবং সেই এক আদর্শে বিশ্বের মানুষ যুক্ত হোক ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে— এই কবির একান্ত কামনা। তিনি বিশ্বাস করতেন,—এবং সে বিশ্বাস রেখেও গেছেন,—ভারতবর্ষে বিধাতৃবিধানেই নিখিল মানুষের সেই মিলন ঘটবে। বিধাতা শত দুঃখ দুর্গতির মধ্য দিয়ে সেই মহা পরিণতির পথেই ভারতকে পরিচালিত করে নিয়ে যাচ্ছেন।

কবির দৃষ্টিতে জনগণ

নিছক সাহিত্যিক মন থেকে রবীন্দ্রনাথ যাদের সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কাব্য, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদির অন্তর্গত সেই সব চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে জনগণের সম্বন্ধে কবির ধারণা কী।
যাঁর কাছ থেকে একদিন শোনা গিয়েছিল—

> এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
> এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা;

দেখা যাক্ তাঁর কালে এদের মুখে কী ভাষা তিনি দিয়েছেন, কী আশা তাদের বুকে জাগিয়েছেন।
তাঁর নাটকের মধ্যেই এই পরিচয় পাবার সুযোগ বেশি। কারণ কাব্য গল্প বা প্রবন্ধ ইত্যাদি অন্যান্য রচনার ক্ষেত্রে জনসাধারণের কথা যা-কিছু তিনি বলেছেন, সে তাঁর নিজের জবানীতেই, কিন্তু নাটকের মধ্যে কথা কয়েছে সাধারণ মানুষেরা এজন্য নাটকেই জনসাধারণের প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে।

"প্রকৃতির প্রতিশোধে"ই বোধ হয় জনসাধারণের প্রথম আবির্ভাব। সেখানে আছে দৈনিক ঘরকন্নার কথা নিয়ে সাধারণ লোকের মধ্যে হাসিমস্করা, মানঅভিমান, ঠেশাঠিশারা, সুখদুঃখের সংকীর্ণ আলোচনা, আর 'রঘুর' মেয়ে অস্পৃশ্যা বালিকার প্রতি সংস্কারগত নির্মম ঘৃণা। "রাজা ও রানী"তে ওরা রাষ্ট্রপীড়িত, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট; বিচারব্যবস্থার আবেদনবাহী। কিন্তু রাজদ্বারের কাছে এসে ভীতিবিহ্বল বিমূঢ় অবস্থায় তারা পশ্চাৎপদ। এর মধ্যে রাজ-অনুগৃহীত হোলেও পুরোহিত দেবদত্ত অন্তরে প্রজাদের বন্ধু। তার মুখ দিয়েই 'মূঢ় মূক'দের সমস্যা ও বেদনা প্রথম ব্যক্ত হয়েছে।

রানী সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করছেন—

আহা কে ক্ষুধিত?

দেবদত্ত বলছেন –

অভাগ্যের দুরদৃষ্ট। দীন প্রজা যত
চিরদিন কেটে গেছে অর্ধাশনে যার
আজো তার অনশন হল না অভ্যাস,
এমনি আশ্চর্য।

সুমিত্রা।

হে ঠাকুর, একী শুনি।
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কাঁদে
অনাহারে?

দেবদত্ত।

ধান্য তার বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞভূমে কুকুরের মতো লোলজিহ্বা
এক পাশে পড়ে থাকে; পায় ভাগ্যক্রমে

কভু যষ্টি, উচ্ছিষ্ট কখনো। বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নয় তো কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে।

দেখা যাবে, এই বক্রোক্তি-মুখর দেবদত্ত-চরিত্রটিই ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে গিয়ে পরবর্তী রবীন্দ্রনাট্যের আরো যত ঋজু উজ্জ্বল আদর্শ চরিত্র-রূপে।

'বিসর্জনের' গ্রাম্য জনসাধারণ তামাক খেতে খেতে নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ থেকে বচসায় মারমুখো, গতানুগতিক সংস্কারাচ্ছন্ন। খরতেজা প্রাচীন ব্রাহ্মণ রঘুপতির নির্দেশে তারা কলের পুতুলের মতো চালিত, কুসংস্কারমুক্ত দেবীসেবক ক্ষত্রিয়যুবা জয়সিংহের যুক্তি তাদের অবুদ্ধির কাছে পরাহত।

'মালিনী'তেও তারা ধর্মান্ধ, সংস্কার-উন্মত্ত।

'প্রায়শ্চিত্তেই প্রথম জনসাধারণের নিজেদের মধ্যে একটি সত্যিকার 'মানুষ' দেখা দিল--যে-মানুষ নির্ভীক, নির্লোভ, অনাসক্ত অথচ সুরসিক; বৈরাগী কিন্তু মানুষের সুখেদুঃখে একান্ত দরদী, বিপদে সম্পদে দশজনের সে পরম সহায়ক। সব রকম অবিচার অন্যায়ের প্রতিবিধানে সে আপোষ-বিমুখ প্রচণ্ড সাংগ্রামিক, আজকালকার কথায় তাকে বলতে হয় সত্যাগ্রহী। সেই চির সত্য-সুন্দরের সেবায় সমর্পিত তার সর্বকায়মন যার প্রকাশ সর্বচরাচরে, প্রতি মানবের প্রাণে প্রাণে। লোকটির ঘর নেই কিন্তু ঘরে-ঘরেই তার পরমাত্মীয়। দোরে দোরে সে মানুষের মন জাগিয়ে বেড়ায়। লোকের সঙ্গে ভাববিনিময় তার গানে গানে। জনসাধারণের নৈতিক মেরুদণ্ডও সে-ই। জনসাধারণের রসজীবনের অফুরন্ত প্রবাহিকা তার প্রাণ। সত্যপথের অনির্বাণ আলোক তার বজ্রবাণী। প্রেম ও শক্তির সে জীবন্ত দীপ্ত বিগ্রহ।

'ধনঞ্জয়' চরিত্র রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ দান। বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন

সাজে এই শক্তিই ফিরে ফিরে দেখা দিয়েছে। এর মূল রয়েছে পূর্ববর্তী 'রাজর্ষি' উপন্যাসের 'বিল্বন' চরিত্রে। অচলায়তনের ঠাকুর্দা ও শারদোৎসবের সন্ন্যাসীর মধ্যেও ধনঞ্জয়েরই আভাস মেলে। 'মুক্তধারা' ও 'পরিত্রাণে' তো সে নাম ধরেই এসেছে। 'রক্তকরবীর' বিশুও তারই রূপান্তর।

গায়ে-প'ড়ে মোড়লি নয়, মোড়লের হাবভাবও নয়, ধনঞ্জয় সাধারণের সঙ্গে মিলে আছে অন্তরঙ্গভাবে, তাদের সুখদুঃখের সমভাগী হয়ে। প্ল্যান্ ক'রে তার জনউন্নতি বা সংগ্রামের কাজ নয়, সাধারণের ভাত-কাপড়ে মানে-প্রাণে হাত পড়েছে, তাই সে সকলের মতো দুঃসহ বেদনায় ছুটে এসেছে তাব প্রতিকারে। তার সাধনা বনে নয়, এদের পাড়াপড়শি হয়ে এদেরই আশেপাশে, এ-যুগের শিক্ষিত নেতাদের জন-বিযুক্ত জীবনে ক্ষণিক খেয়ালের যোগসাধন তার নয়, তার যোগ একান্তই প্রাণের। সংসারত্যাগী হয়েও আপদে বিপদে সে গৃহস্থের বন্ধু ও নির্ভর। ঈশ্বর-পরায়ণ সাধনভজনকারী সাধু সে নয় অথচ আধ্যাত্মিকতাই তার জীবনের ভিত্তি ও অবলম্বন।

নেতা যিনি হবেন তাঁর চরিত্রে আধ্যাত্মিক সাধনার এমনি একটি স্বাভাবিক ভিত্তি না থাকলে দেশের লোক তাঁকে ঠিক অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারে না। দেশের সঙ্গে তাঁর প্রাণের ও শিক্ষাসাধনার মিল থাকবে। দেশের আপামর জনসাধারণকে আপন বলে তিনি জানবেন। এই জানার জন্য তাঁকে সাধনা করতে হবে, উত্তেজনার কারণ এলেও তাঁকে থাকতে হবে সংযত, সিদ্ধিপ্রতীক্ষ। কত গভীর করে জানতে হবে নিজেকে, দেশকে!—'গুরুগোবিন্দ' কবিতায় দেশের সেই মর্মগত চাওয়াকে বাণীরূপ দিয়েই যেন সাধনাধিষ্ঠিত জনগুরু বলছেন—

এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ
আরো কতদিন হবে।

চারিদিক হতে অমরজীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে।
কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগোরে সকল দেশ।

বাউল ধনঞ্জয় উত্তেজনায় অপ্রমত্ত কিন্তু কর্তব্য পালন করতে লক্ষ বাধার মুখেও সে একাগ্র সাধনায় প্রাণপণে এগিয়ে চলেছে। তার কোনো অস্ত্র নেই, কণ্ঠে আছে মাত্র গান, গানই তার অস্ত্র। এ যেন সেই জাতের মানুষ,—"আহ্বান শুনে সংকট আবর্তমাঝে যে নির্ভীক প্রাণে ছুটে চলে, বিশ্ব বিসর্জন দিয়ে নির্যাতন লয় বক্ষ পেতে। মৃত্যুর গর্জন শোনে সে সংগীতের মতো", বলে, -

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।
আগুন তারে দহন করবে কী, সে গায়—
আগুন আমার ভাই, আমি তোমারি জয় গাই।
সকল ভয় থেকে মুক্তির ডাক নিয়ে গেয়ে বেড়ায়—
নাই ভয় নাই ভয় নাই রে,
থাক্ পড়ে থাক্ ভয় বাইরে।

তাকে বাঁধবেই বা কে, যে বলে—

ওরে শিকল তোমায় অঙ্গে ধ'রে
দিয়েছি ঝংকার।

বলে, শিকল আমায় বিকল করবে না।
তোর মারে মরম মরবে না।

তাকে বাঁধা কি সহজ—সে বলে,

আমাকে যে বাঁধবে ধ'রে এই হবে যার সাধন
সে কি অমনি হবে?

কারো হুমকি বা হুকুমের সে বশ নয়, রাজা যখন বলে, সে বন্দী রইল, সে বলে—

রইল ব'লে রাখলে কারে
হুকুম তোমার ফলবে কবে?

শুধু সেই একজনকেই সে জানে, সে সকল ভয়ের ভয়, বিপদ তাঁকে তার কাছ থেকে কাড়তে পারে না।
সাধনার দুর্গম পথে যেখান থেকে যত মার খাক্—সে বলে "আরো আরো প্রভু আরো আরো।...দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো।"
তাঁর কাছেই তার কামনা—

আমরা বসব তোমার সনে;
শরিক হব রাজার রাজা
তোমার আধেক সিংহাসনে॥

অনন্ত শক্তির উৎস তার সেই রাজার রাজা। ভয়ে ভয়ে দাস্যভাব নিয়ে মাথা নুইয়ে সে যায়নি তাঁর কাছে, সে যেতে চায় সিংহাসনের শরিক

হয়ে,—এতখানি তার দাবি। তার এই ভগবদ্‌ভক্তির জোরে সে নিজে যেমন সংসারের ভয় থেকে মুক্ত হয়েছে, তেমনি গানে গানে অভয়বাণী ছড়িয়ে মুক্তি দিয়েছে জনগণকে। জনগণ তার সঙ্গ ধ'রে ভগবানের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলবার ভরসা পায়, সমস্ত দুঃখকষ্ট তাদের কাছে সহনীয় হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশে বাস্তবেও দেখা গেছে, আগে অজ্ঞাতবাসে থেকে দেশকে জেনে, সত্যপরীক্ষার আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজের জীবনকে নিয়োজিত করে, তারপরে মহাত্মাজী দেখা দিলেন দশের সামনে সকলের একজনা হয়ে। তারপর থেকে সংগ্রামে, সহিষ্ণুতায়, নির্ভীকতায় তিনি যেন ধনঞ্জয়েরই দোসর। তাঁর প্রতিও জনচিত্তের অকুণ্ঠ বিশ্বাসের অন্যতম কারণ তাঁর চরিত্রের আধ্যাত্মিক ভিত্তি। আধ্যাত্মিকতা বা ভগবদ্‌ভক্তির উল্লেখে আজকের দিনে হাস্যোদ্রেকের সম্ভাবনা থাকলেও দেশের এই আধ্যাত্মিক প্রবণতার কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। মনে হয় মহাত্মাজী যেন রবীন্দ্রনাথেরই মানসনেতার বাস্তব রূপ। ধনঞ্জয়ের মতোই তিনি সকল প্রকার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে, ধনঞ্জয়ের মতোই তাঁর উদার চরিত্র। তিনি সকল সম্প্রদায়ের; নিখিল মানবের মুক্তি কামনা তাঁর জীবন ও বাণীকে সকল কালের সকল জনের শ্রদ্ধার বস্তু করে তুলেছে।

'প্রায়শ্চিত্তে'র লোকনেতা কোনো অতিমানব নন, সাধারণের মধ্য থেকেই সহজভাবে তাঁর উদ্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে একটি গভীর ইঙ্গিত করেছেন।

ইঙ্গিতটি এই যে, জননেতা আসবে—জনতার মধ্য থেকেই, এবং ব্যক্তি-আকারে সে হবে একটি প্রেরণা মাত্র, সক্রিয় সচেতনতা। ধনঞ্জয়ের গায়ে নেতার কোনো ছাপ নেই, শুধু তার কথা ও গানের মধ্যে একটি চেতনার ঢেউ যেন জনতার মনে বারে বারে এসে আঘাত করছে। এই ব্যাপক লোকচেতনা যেদিন ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র দেশে, সত্যিকার

গণজাগরণও সেদিন অনিবার্য হয়ে ওঠে। গণ-মুক্তির সূচনাও সেই-দিনই। সেদিন নেতার প্রয়োজনও যায় ফুরিয়ে। যা করবার জনসাধারণ আপনারাই করে নেয়। মেষের মতো বিচারবুদ্ধিহীন জনতাকে চরিয়ে বেড়ায় যে নেতা, তাকে চাননি রবীন্দ্রনাথ। মূঢ় জনসাধারণের এই নির্বিচার নেতা-অনুরক্তি ও তার অন্ধ অনুসরণের উপরেই ঘা দিয়েছেন তিনি ধনঞ্জয়েরই মুখ দিয়ে।

'মুক্তধারা'র একজায়গায় সে বলছে—ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে, রাজা।

রাজা রণজিৎ বলছেন—কিসের ভাবনা?

ধনঞ্জয়। তোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়েও যা করতে পারোনি আমি দেখছি তাই করে বসে আছি। এতদিন ঠাউরেছিলুম, আমি ওদের বলবুদ্ধি বাড়াচ্ছি; আজ মুখের উপর বলে গেল আমিই ওদের বলবুদ্ধি হরণ করেছি।

রণজিৎ। এমনটা হয় কি ক'রে?

ধনঞ্জয়। ওদের যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয়নি আর কি। দেনা যাদের অনেক বাকি, শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না তো। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন তা নামঞ্জুর করে দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই আঁকড়ে থাকে।

রণজিৎ। ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে জেনেছে।

ধনঞ্জয়। তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্যন্ত পৌঁছল না। ভিতর থেকে যিনি ওদের চালাতে পারতেন বাইরে থেকে আমি তাঁকে রেখেছি ঠেকিয়ে।

রণজিৎ। রাজার খাজনা যখন ওরা দিতে আসে তখন বাধা দাও, আর দেবতার পুজো যখন তোমার পায়ের কাছে এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না?

ধনঞ্জয়। কে ওরে বাপরে! বাজে না ত কি? দৌড় মেরে পালাতে পারলে

বাঁচি। আমাকে পুজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চলল, সে দেনার দায় যে আমারও ঘাড়ে পড়বে, দেবতা ছাড়বেন না।
রণজিৎ। এখন তোমার কর্তব্য?
ধনঞ্জয়। তফাতে থাকা। আমি যদি পাকা ক'রে ওদের মনের বাঁধ বেঁধে থাকি, তাহলে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন একসঙ্গেই তাড়া লাগান।

এইখানেও ধনঞ্জয়ের সঙ্গে মহাত্মাজীর মিল লক্ষণীয়। ধনঞ্জয়ের মতোই মহাত্মাজীরও কথা ও কাজ জনগণকে মতে ও পথে স্বাবলম্বী করে তোলার দিকেই একাগ্রভাবে নিবদ্ধ। মহাত্মাজী যখন দেখলেন দেশের সর্বজনীন কল্যাণ ছেড়ে ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের দিকেই লোকের অন্ধ অনুরক্তি, অমনি তিনি নেতৃত্ব থেকে অবসর নিলেন। ঘোষণা করে দিলেন "কংগ্রেসের চার আনারও সদস্য" নন তিনি। "দশজনের দেশ, দশজনে যা-হয় বুঝে কর।"—এই বলে তিনি অন্তরাল থেকে জনগণকে চালিয়ে দিলেন স্বাধীন অভিযানে। নিজে রইলেন না গদী আঁকড়ে। চলার মুখে সময়ে সময়ে বেসামাল হয়ে টাল সামলাতে যখনই দেশ তাঁকে ধরতে গেছে অমনি তিনি নাগাল কেটে সরে গিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সেই একই উক্তি "চার আনা.. "।
ধনঞ্জয়ের কাছে সঙ্কীর্ণচিত্ত, ভীত, বিচ্ছিন্ন জনসাধারণ পেয়েছে অভয়, সাম্য, সংহতি, ও স্বাবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে সর্ববন্ধন থেকে উদার মুক্তির বাণী। গান্ধীজীর প্রেরণাও দেশকে সেই বৃহৎ মুক্তির দিকেই নিয়ে চলেছে। মহাত্মাজীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আর-একটি আদর্শ সার্থকভাবে পরিস্ফুট, সে হচ্ছে "অস্পৃশ্য-সেবা"। আত্মঘাতী সমাজব্যবস্থা এই অস্পৃশ্যতার ফাঁস থেকে মুক্তির বাণী তিনিই এনেছেন দেশে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাটক 'অচলায়তনে' সামাজিক বিপ্লব এই অস্পৃশ্যদের নিয়ে দেখা দিয়েছে।

নিরক্ষর, সহজ সরল ও সংস্কারহীন 'অচলায়তনে'র শোণপাংশু ও দর্ভকদল চাষ-আবাদ করে, স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনই তাদের পেশা। উচ্চজাতের কাছে ঘৃণা ও নির্যাতন পেয়ে পেয়ে এরা অন্তরে তাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন। তাদের থেকে তফাতে থাকতেই এদের স্বস্তি। এরা সহজে উত্তেজিত হয় না। কিন্তু এক সময় আসে, যখন এদের আত্মসম্মানে ঘা দিলে এরা মরীয়া হয়ে অত্যাচারীকে ধ্বংস করতে হিংস্র হয়ে ওঠে। সত্যিকারের অন্তরের স্পর্শ পেলে এরা আবার তেমনি অনুগত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ এরা শান্তপ্রকৃতি বটে কিন্তু একেবারে সংগ্রামবিমুখ নয়। সমাজের বাস্তব অস্পৃশ্য শ্রেণীর এরা প্রতিচ্ছবি। এদের মধ্যে মুক্তিপ্রেরণা এনেছেন ঠাকুর্দা।

'রাজা' বা 'অরূপরতনের' জনসাধারণ—সাধারণবুদ্ধির লোক, একটু যেন নির্বোধ, একটু কুঁদুলে, রসিকতাপরায়ণ। রবীন্দ্রনাথের জনতা অল্প-বিস্তর সর্বত্রই মোটামুটি এইরকম।

একমাত্র 'ডাকঘরের' সাধারণের চরিত্রগুলিই যেন বিশেষভাবে শিল্পী-মনের পরিচ্ছন্ন রুচি ও নিপুণ কারিকুরি দিয়ে রচিত। ভদ্র ও সুস্থ স্বাভাবিক এদের মন—বাহুল্যবর্জিত মার্জিত এদের কথাবার্তা, চালচলন। অন্যান্য নাটকে জনসাধারণ যেন কতকটা প্রক্ষিপ্ত,—গুরু-গম্ভীর দৃশ্যাবলীর মাঝে মাঝে একটু হালকা আবহাওয়ার আমেজে হাঁফ ছেড়ে নিতেই যেন জনতার দৃশ্যগুলির অবতারণা। কিন্তু 'ডাকঘরে' জনসাধারণের যে-কয়টি পাত্রপাত্রীর সমাবেশ আছে, তারা প্রত্যেকেই নাটকের বিশিষ্ট অঙ্গ এবং তাদের নিয়েই নাটকের গতি গেছে এগিয়ে। এদের মধ্যে মোড়লটি মেজাজে একেবারে যথার্থ মোড়ল। অল্পকথায় এবং সেই কথার সুরে প্রত্যেকেরই এমনি চরিত্রানুগ ব্যবহার ও চরিত্ররস প্রকাশ পেয়েছে। যে যার কাজ নিয়ে আছে নিজের গণ্ডিতে। নৈর্ব্যক্তিক সাধারণের মধ্যে ব্যক্তির এই বিষয়লিপ্ত সীমাবদ্ধ দিকটা 'ডাকঘরে'র সীমামুক্তির বাণীকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে। অব্যবস্থিত-ভাবের

কোনো কথার আবর্জনা এ নাটকে জনসাধারণকে ভারাক্রান্ত করেনি। অন্য নাটকে দোষেগুণে তারা যেমন স্বাভাবিক, এখানে সে হিসাবে একটু যেন সুসীম, সযত্নরচিত, এক কথায় কিছুটা 'সাজানো'। ওরা যেন এই জগতের নয়, একটা রূপকথালোকের মানুষ।

'মুক্তধারা'য় রাজশক্তি শোষণ করছে প্রজাকে, তাদের বশে রাখতে চায় পীড়ন দ্বারা ভয় দেখিয়ে; মুক্তধারার ঝরনাকে বেঁধে তাদের অন্নের মূল সংস্থান কৃষিকে উৎখাত করছে যন্ত্র, তাদের পিপাসার জল দিয়েছে বন্ধ করে,—এই নিয়েই তাদের বিদ্রোহ। এখানেও বিদ্রোহের নেতা ধনঞ্জয়। 'প্রায়শ্চিত্ত', 'মুক্তধারা' ও 'পরিত্রাণের' জনসাধারণ একই প্রকৃতির এবং তাদের পরিণতিও প্রায় একই রকম। কেবল এক্ষেত্রে একটি জিনিস নতুন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সে হচ্ছে রাজার ভেদমূলক শাসন-কৌশলে দুষ্ট রাজনীতি। শিবতরাই আর উত্তরকূটের লোকদের মধ্যে প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে রাজা একদলকে অন্যদলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ ক'রে প্রকারান্তরে দু'দলকেই দুর্বল করে রেখে শাসন চালাতে চান সুকৌশলে। শিক্ষার নামে পাঠশালা থেকেই ভেদ-সংস্কারে কলুষিত বিকৃত করে দেওয়া হচ্ছে শিশুদের সহজ বুদ্ধিকে।

ব্রিটিশ আমলে দেখা গেছে ভারতে একই ব্যাপার। পার্থক্য এই, প্রাদেশিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতা আর রাজনৈতিক দলাদলি। তবে 'প্রায়শ্চিত্তে'র মতো 'মুক্তধারা'র বিভ্রান্ত জনগণের মধ্যেও আছে ধনঞ্জয়, আর নানা দলাদলি মারামারির পরিস্থিতিতে দেশের দশের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন মহাত্মাজী।

'রক্তকরবী'তে জনসাধারণের একটি বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পেয়েছে—সে হচ্ছে তাদের আধুনিক যুগের যান্ত্রিক রূপ। যন্ত্রণাই তার মূলকথা। স্বর্ণলালসায় উন্মত্ত রাজা, কৃষি থেকে টেনে এনে, নিঃস্ব লোকগুলোকে খনিতে নামিয়ে তাদের রক্তের বিনিময়ে ঐশ্বর্যক্ষুধা মেটাবার দুশ্চেষ্টায় মত্ত। জমিজমাবৃত্তিহারা দিন-মজুরি করতে জনসাধারণ এসে ভিড়েছে

তাঁব খনিব কাজে। ঘববাড়ি হাবিযে দাঁড়িযেছে এসে তাবা বস্তিতে। সেখানে চলছে শোষণ, শাসন, ব্যভিচাব, ষড়যন্ত্র,—কলে পিষে পিষে নিংড়ে নিচ্ছে তাদেব প্রাণবস—শেষে মানুষগুলোকে ছোবড়াব মতো ছুঁড়ে ফেলছে সর্বনাশেব আঁস্তাকুড়ে। জনসাধাবণ সেখানে বিকৃত বিভ্রান্ত, অসহায, নামজাতিগোত্রহীন কুলিমজুবেব শ্রেণীতে পবিণত, তাদেব পবিচয হচ্ছে ৪৭ফ, ৬৯৬। অর্থবিলাসী বাজাব কূটচক্রী অত্যাচাবী আমলাতন্ত্রেব হাতে তাবা খেলাব পুতুল মাত্র। তবে ওদেবো মধ্যে আছে বিশু, সে ওদেবই একজন,—সত্যসুন্দবেব জযবাণী তাবই কণ্ঠে ধ্বনিত হযে চলেছে ওই মানুষ-পেষা বীভৎস কুলিবস্তিব অলিতে গলিতে।

ববীন্দ্রনাথেব জনগণ সত্যিই মূক মূঢ এবং ম্লানমুখ, নিজেব নিজেব ঘবোযা সমস্যা নিযেই তাবা মেতে আছে, বুদ্ধিকে জড কবে বেখেছে কুসংস্কাবাচ্ছন্ন চণ্ডীমণ্ডপেব ক্ষুদ্র গণ্ডিতে, তাব বাইবে তাদেব দৃষ্টি নেই। বাজাব শাসন এদেব কাছে আধিব্যাধিব মতোই কপালেব লিখন মাত্র। চালচলনে প্রায ক্ষেত্রেই এবা যেন হাবাগোবা স্থলবিশেষে এদেব ভযবিহ্বল বিব্রত ভাবেব মূঢ বাদানুবাদ হাস্যকব। জ্ঞানকাণ্ডহীন ভক্তি বিশ্বাস কতদূব হাস্যকব হতে পাবে তাব পবিচয মেলে 'সে বইযেব গেছোবাবা অধ্যাযে।

বাজা ও বানীতে দেখা গেছে এবা বাজ-অত্যাচাবে বিদ্রোহভাবাপন্ন কিন্তু শেষাবধি ভযে ম্রিযমাণ বাজদ্বাব পর্যন্ত এগোবাব সাহস বা উদ্যম তাদেব নেই। 'প্রাযশ্চিত্তে বাজদ্বাবে মাব খেযে ভগ্নোদ্যমে প্রথমটা পশ্চাৎপদ হোলেও তাবা যখন নেতৃস্থানীয ধনঞ্জযকে হারাল তখন নিজেবাই দাঁড়াল বুখে। কোনো ভয ভাবনাই আব তাদেব ফেবাতে পাবল না। তাবা সোজাসুজি প্রবল প্রতাপান্বিত বাজা প্রতাপাদিত্যেব সামনে দাঁড়িযে সবাসবি তাদেব দাবি জানাল। তপতী'তেও বাজাব কুশাসনেব বিবুদ্ধে ক্ষুব্ধ জনসমুদ্র এসে প্রলয গর্জনে ভেঙে পড়েছে

রাজপুরদ্বারে। রত্নেশ্বর নামে অত্যাচারিত সেই জনগণেরই একজন এসে রানীকে বলছে—"মা, এটুকু কথা নিয়ে দুঃখ কোরো না,—আমাদের অন্ন সম্বল অল্প, তার কান্না কেঁদে কেঁদে আমাদের স্বর ক্লান্ত। সেই সম্বলকে যখন কেউ স্বল্পতর করে তখন তা নিয়ে অভিযোগ করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাদেরও মর্মস্থান আছে, সেখানে রাজায় প্রজায় ভেদ নেই ; সেখানে যদি রাজা হাত দেন সে আমাদের সইবে না।"
রানী বললেন,—"বলো সব কথা। ভয় কোরো না।"
রত্নেশ্বর বললে—"আমরা অত্যন্ত ভীরু মহারানী, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখে আমাদেরো ভয় ভেঙে যায়। সেইজন্যেই এমন করে চলে আসতে পেরেছি। জানি বিপদ সাংঘাতিক, কিন্তু বিপদের চেয়ে যেখানে গ্লানি দুঃসহ সেখানে আমাদের মতো দুর্বলও বিপদকে গ্রাহ্য করে না। না খেয়ে মরার দুঃখ কম নয়, কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন বেঁচে থাকার মতো দুঃখ আর নেই।"
'তপতীতে' জনগণের নির্ভীক অভিযান চলেছে নেতা ব্যতিরেকেই। নিজেরাই এগিয়ে এসেছে নিজেদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারে, পড়ে পড়ে মার খায়নি আর ভাগ্য, বিধাতা, ইত্যাদিকে দায়ী করেনি কিংবা এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে শেষটা গৃহবিবাদে মত্ত হয়নি। কিন্তু এখানেও কতকটা দুঃখের উত্তেজনাই বাইরে তাদের ঠেলে এনেছে, সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধির প্রেরণায় এখনো তারা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নয়। সে চেতনা এসেছে "কালের যাত্রায়"।
'কালের যাত্রায়' শূদ্ররা পড়ছেন শাস্ত্র। "হাত থেকে কাড়তে গেলে বলেন, আমরা কি মানুষ নই?" "দলে দলে ওরা আসছে ছুটে, বলছে, রথ চালাব আমরা" ওদের আজ বাধা দেবে কে? "বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে—চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।"
রবীন্দ্রনাথের নাটকে ক্রমপর্যায়ে শক্তির এই বিবর্তন ধারা বহমান। এর আগে অন্যান্য নাটকে ওরা বাধা পেয়ে-পেয়েই এসেছে, কিন্তু তাতে

তাদের গতি রুদ্ধ হয়নি, বরং নির্যাতন তাদের জাগরণকে দিনে দিনে আরো এনেছে এগিয়ে। এখানে তারা নেতার অপেক্ষা করেনি। দলপতি একজন এখানেও আছে বটে কিন্তু সে-থাকা কতকটা মুখপাত্র হিসাবে থাকা মাত্র, তার কথাতেই বোঝা যায়, দলের প্রত্যেকেই যেন সেখানে দলপতির শক্তি ও দায়িত্ব নিয়ে আগুয়ান। তারা সকলেই ডাক শুনেছে এবার রথ চালাতে হবে, রথের রশি ধরতে হবে যে তাদেরই। পুরোহিত বলছে- "রশি ধরতে! ভারি বুদ্ধি তোমাদের। জানলে কী করে।" দলপতি বলছে "কেমন করে জানা গেল, সে তো কেউ জানে না। ভোর-বেলায় উঠেই সবাই বললে সবাইকে, ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছড়িয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়, পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী, পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর। ডাক দিয়েছেন বাবা।"

সৈনিক বললে, "রক্ত দেবার জন্যে।"

দলপতি বললে, "না, টান দেবার জন্যে।"

পুরোহিত "বরাবর সংসার যারা চালায়, রথের রশি তাদেরই হাতে।"

দলপতি -"সংসার কি তোমরাই চালাও ঠাকুর।"

পুরোহিত—"স্পর্ধা দেখো একবার। কথার জবাব দিতে শিখেছে,— লাগল ব'লে ব্রহ্মশাপ।"

দলপতি "মন্ত্রীমশায়, তোমরাই কি চালাও সংসার।"

মন্ত্রী "সে কী কথা। সংসার বলতে তো তোমরাই। নিজগুণেই চলো, তাই রক্ষে। চালাক লোকে বলে আমরাই চালাচ্ছি। আমরা মান রাখি লোক ভুলিয়ে।"

দলপতি— "আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ : আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।"

শুনে সৈনিক বলছে- -"সর্বনাশ। এতদিন মাথা হেঁট করে বলে এসেছে ওরা—তোমরাই আমাদের অন্নবস্ত্রের মালিক। আজ ধরেছে উলটো বুলি। এতো সহ্য হয় না।"

জীবনের সবচেয়ে কঠিন সমস্যা অন্নবস্ত্রের। মহাকাল বুঝিয়ে দিলে মানুষ যতই সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, দর্শন ইত্যাদি নিয়ে সভ্যতার পোশাকিয়ানার দিকটা চর্চা করুক না কেন, গোড়াকার সমস্যা তার বেঁচে থাকা। সেখানে অন্নবস্ত্রের মতো প্রয়োজনীয় আর কিছুই নয়। আর তারই জোগানদার হচ্ছে জনগণ। তাকে মেরে কেউ বাঁচতে পারবে না। জনগণও নির্যাতিত হয়ে-হয়ে আজ বুঝতে পারছে তারা সভ্যতার কতটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ। তাদের জোরেই ঘোরে সভ্যতার চাকা। নইলে সব অচল। এখন তারা নিজেদের ওজন বুঝে সচেতন হয়ে উঠেছে। তাই ক্রমশ তাদেরই হাতে গিয়ে পড়ছে জগতের রাষ্ট্রচালনার ভার। আজ তারা তাই বুলি ধরেছে "জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।" এই আত্মচেতনা, স্বাবলম্বন ও সংঘবদ্ধ অগ্রগতির আশা ও ভাষাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জনগণকে দিয়ে গেছেন।

'প্রায়শ্চিত্তে' দেখা যায় ধনঞ্জয়ের মুখেই প্রথম ভাষা নিয়ে বেরিয়েছে,—

"বেশ বেশ, অর্ধেক রাজত্ব চাইবি নে?"

প্রজাদের একজন বলছে, "ঠাট্টা করছ ঠাকুর।"

ধনঞ্জয় বলছে,—"ঠাট্টা কেন করব? সব রাজত্বটাই কি রাজার? অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয়তো কী? চাইতে দোষ নেই রে! চেয়ে দেখিস্।"

'প্রায়শ্চিত্তে'র জনসাধারণ যেটা আশা করতে পারছে না, শুধু ধনঞ্জয়ের অর্থাৎ নেতার মুখের ভাষাতেই যে কথার প্রথম প্রকাশ,—'কালের যাত্রা'য় তারা নিজেরাই তার চেয়ে বড়ো অধিকারের বিষয় দাবি করে সজোরে এবং সুদৃঢ় বিশ্বাসে বলছে—"মন্ত্রীমশায়, তোমরাই কী চালাও সংসার?"

বেশি বলার কি আর দরকার আছে,—বাস্তবেও আজ সংসার চালাতে যাচ্ছে কারা? বিশ্বের প্রধান ত্রিশক্তির অন্যতম রাশিয়াই কি আজ ঘরের গণ্ডি ছেড়ে বিশ্বরাষ্ট্র পরিচালনার সারথ্যে নামেনি? রক্ষণশীল বৃটেনেও শ্রমিকশক্তির রাষ্ট্রনেতৃত্ব কি 'কালের যাত্রা'রই সমর্থক নয়!

রবীন্দ্রসাহিত্যে জনগণের একটি দিক

তেল আর আলোর উপমাটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়। তেল পোড়ে আলো জ্বলে; প্রদীপকে জ্বলবার এই সুযোগ দেওয়াই তেলের কাজ। তাই দিয়েই সে ধন্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও জনসাধারণই করেছে তেলের কাজ, যুগিয়েছে জীবনযাত্রার স্থূলতম আদি উপকরণ, খাওয়া-পরা এবং পরিচারণা। আলো বিকিরণ ছিল রবীন্দ্রনাথের কাজ এদের কাছ থেকে রসদ পেয়ে তিনি সে কাজ করে গেছেন অক্লান্ত নিষ্ঠায়। কবির জীবনযাত্রায় জমীদারির আয়টা ছিল বরাবরকার প্রধান সম্বল। কৃষকদের খাজনা থেকে সেটার যোগান। এর প্রতিদানে কবি তাদের কী দিয়েছেন সে সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক, সাধারণ লোক তাই দিয়ে কবির নৈতিক দায়িত্ববোধের যাচাই করতে চাইবে। কিন্তু আলো তেলকে কী দিয়েছে সেই থেকেই কি আলোর বিচার করি? আলো থেকে আলো পাচ্ছি কি না, আসলে সেটাই তো বিচার্য।
শুধু প্রজাদের মহালে দানদস্তুর, খাজনামাপ, চাষের উন্নতি, রাস্তাঘাট, ডাক্তারখানা বা মক্তব পাঠশালার ব্যবস্থা করে তাদের ভালো করতেই নয়,—রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন বিশ্বসভ্যতার বাণী নিয়ে, সমগ্র

পৃথিবীতে মনের আলো জ্বালাতে। সেই কাজ তিনি যদি ঠিকমতো করে গিয়ে থাকেন, তবেই বলব, তিনি যথার্থ নৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন। কারণ, রসদ দুদিনের জিনিস, টাকা পয়সা, এমন কি কায়িক সেবাও তাই, কিন্তু জ্ঞান বা রসের জিনিস চিরকালের। এজন্যই ধনের দেনা শোধ করা যায়, মনের দেনা অপরিশোধনীয়। দিনে দিনে বিদ্যাবুদ্ধি বাড়বার সঙ্গে সে দেনার দায়ও সুদে সুদে বেড়েই চলে। প্রজারা ওঁকে যে অর্থ জোগাল ওঁর জীবনের সঙ্গেই তার সমাপ্তি, কিন্তু উনি পৃথিবীতে যে 'অর্থ' দিয়ে গেলেন, পুরুষানুক্রমে পৃথিবীর 'প্রজাদের' সঙ্গে শিলাইদর প্রজারা তা ভোগ করবে। সুদূর ভবিষ্যতে এই তেল যোগানো উপলক্ষ্যের স্মৃতিটুকুই হবে তাদের কাছে অক্ষয় সম্পদ, যা নিয়ে তারা বিশ্বের দরবারে অতুল মহিমাগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াবে। রবীন্দ্রনাথের মন ছিল জ্ঞানরাজ্যের—টাকার দেনা টাকা দিযেই শোধ করতে তাঁর মনে ততটা তাগিদ জাগেনি,- যতটা চিন্তার প্রবণতা জেগেছে দরিদ্র নিপীড়িত দেশবাসীর শিক্ষা-দীক্ষা, জীবন-মান উন্নয়নের দিকে। এই দিকের চিন্তা বা কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে যে পথের নির্দেশ তিনি রেখে গেছেন, সেই পথে বহু অর্থ, বহু মান ফিরে আসবে জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর প্রজাদের তবিলেও। হাতে হাতে দায় চুকিয়ে দেবার নগদ ব্যবস্থাও যে তাঁর কিছু না ছিল এমন নয়। কিন্তু, মোটের উপর জনসাধারণের বিচিত্র সব সমস্যা চিন্তার উপকরণ হিসেবেই কবির মানসিক রাজ্যে স্থান পেয়েছে। ওদের জন্য তাঁর সাহিত্যে কিংবা কর্মে কী তিনি করে গেছেন তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে অন্যত্র। ওরা তাঁর জন্যে কী করেছে তারই একটু পরিচয় এখানে দেওয়া যাক। দুটি ক্ষেত্রে সে পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রজা হিসাবে খাজনা যোগানোর কথা বলাই বাহুল্য। আর একটি প্রধান অথচ অপ্রত্যক্ষ, অবজ্ঞাত দিক আছে, যেদিকে লোকের দৃষ্টি এখনো তত সজাগ নয়। সে ক্ষেত্রটি হচ্ছে তাঁর পরিচর্যার ক্ষেত্র। নামগোত্রহীন সাধারণ লোকেরাই খাইয়ে-পরিয়ে

কবিকে মানুষ করেছে, –অর্থ সরবরাহ থেকে শুরু করে রাঁধাবাড়া, কাপড়জামা পরানো ইত্যাদি দৈহিক পরিচর্যার সমস্ত ভারই বহন করেছে তারা, তাঁর ভৃত্যরূপে। কবির গৃহস্থালীতে তাঁর আত্মীয়-সাহচর্যের সুযোগ ছিল স্বল্প। দৈবচক্রে ভৃত্যের হাতে তিনি মানুষ। শৈশব থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর অতিবাহিত হয়েছে কম বেশি একরকম ভৃত্যদের হাতেই। তাই 'জীবনস্মৃতি'র প্রথমেই এসে গেছে সেই 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রের' কথা। বহু সন্তানবতী মাতা বড় ঘরের ঘরনী হয়ে থাকতেন বহু পরিজন-পরিবৃত বহু কাজে লিপ্ত। তারপরে কবির জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। এজন্য মাতার হাতে লালিত হওয়ার সুযোগ কবি তেমন পাননি। চাকরদের হাতে তাঁকে পড়তে হয়। লিখেছেন, "ভৃত্যদের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ ভার পড়িয়াছিল।" কিন্তু সে-সময়কার ভৃত্যদের স্মৃতি খুব সুখকর নয়। অনেকের মধ্যে একজনের কথাই তাঁর স্পষ্ট মনে ছিল, "তাহার নাম ঈশ্বর" - মানে ব্রজেশ্বর। তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল, কবির ভাষায় "আমাদের মতো হেলায় মানুষ ছেলেদের খবরদারির কাজে।" "ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধ্যে বেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড রামায়ণটা।" "চাকরদের বড়ো কর্তা ব্রজেশ্বর, ছোটো কর্তা যে ছিলো তার নাম শ্যাম। বাড়ি যশোরে, খাঁটি পাড়াগেঁয়ে, ভাষা তার কলকাতায়ী নয়। সে বলত, ওনারা, তেনারা, খাতি হবে, যাতি হবে, মুগির ডাল, কুলির অম্বল। দোমনি ছিল তাঁর আদরের ডাক। তার ছিল শ্যামবর্ণ, বড়ো বড়ো চোখ, তেল চুকচুকে লম্বা চুল, মজবুত দোহারা শরীর। তার স্বভাবে কড়া কিছুই ছিল না। মন ছিল সাদা। ছেলেদের 'পরে তার ছিল দরদ। তার কাছে আমরা ডাকাতের গল্প শুনতে পেতুম।" এই গল্প শোনানোর সূত্রে বাল্যের আর দুটি দাসীর খবর তিনি দিয়েছেন, "ছেলেরা তখন বিছানায়। পিয়ারী কিংবা শঙ্করী গল্প শোনাচ্ছে, কানে আসছে—'জ্যোছনায় যেন ফুল ফুটেছে'।"

জ্যোৎস্নায় ফুল ফুটে যে-মাধুর্যের সঞ্চার করে,—একমাত্র ব্রজেশ্বর ছাড়া অন্য সব দাসদাসীর স্মৃতিই এমনি মাধুর্যে মণ্ডিত! ভালোমন্দ যখনই কারুর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, সব ক্ষেত্রেই একটি অন্তঃশীলা দরদের প্রস্রবণ থেকে গেছে।

যৌবনে বিবাহিত জীবনে সাধ্বী স্ত্রীর সেবাযত্ন যখন তাঁর জন্য কানায় কানায় উন্মুখ হয়ে আছে, তখনো বিষয়কর্মের ব্যস্ততায় ভোগ করতে পারেননি তা' নিরবচ্ছিন্নভাবে। জমিদারীর মহাল থেকে মহালে ঘুরতে হয়েছে, কাটাতে হয়েছে কাছারীর দিনগুলি এক এক সময় নিঃসঙ্গ এককতায়। সে সময়েও তাঁকে ভৃত্যদের হাতেই থাকতে হয়েছে। একই অবস্থা ঘটেছে তাঁর বোলপুরের প্রাথমিক জীবনে। পত্নী সকল ভার নিয়ে অল্পদিনই কাছে থাকতে পেরেছিলেন। কবির দাম্পত্য জীবন ছিল স্বল্পায়ু। এই পর্বের চারটি পরিচারকের যোগ কবির জীবনে অক্ষয় হ'য়ে আছে। বিপিন, উমাচরণ, ঝগড়ু ও সাধু। উমাচরণের মৃত্যু-সংবাদে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা একখানি পত্রে উমাচরণের সঙ্গে কবির সম্বন্ধটি এবং ঐ প্রসঙ্গেই সাধারণভাবে কবির জীবনে প্রভুভৃত্য সম্বন্ধের একটি প্রাণময় চিত্র সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। লিখেছেন,—"উমাচরণ বাঁচবে না আমি জানতুম, তবু তার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ছোটবেলা থেকে ও আমাদের কাছে মানুষ হ'য়ে এসেছে। ওর জীবন আমার জীবনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল, আমার সেবা ওর পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়ে এসেছিলো। আমাদের জীবনের দৈনিক তুচ্ছ ভারগুলি যারা বহন করে তারা আমাদের বোঝা কত হালকা করে দেয় তা' তাদের অভাবে খুব স্পষ্ট বুঝতে পারি। এবার দেশে ফিরে গেলে উমাচরণের অভাবে আমার জীবনযাত্রা কত দুরূহ হবে তা বেশ কল্পনা করতে পারছি। আমার নিজের প্রয়োজন যৎসামান্য কিন্তু সেইজন্যই সেই প্রয়োজনগুলি সুসম্পন্ন না হলে জীবনের কল বিগড়ে যায়। আমার কাছে কোন অতিথি অভ্যাগত এলে

উমাচবণেব উপব ভাব দিযে আমি খ্ব নিশ্চন্ত থাকতে পাবতুম্—ও তাদেব খাইযে দাইযে হেসে গল্প ক'বে খ্সী কবে দিতে পাবত। তাছাডা ও যতই দোষ অপবাধ কব্ক আমাকে অন্তবেব সঙ্গে যত্ন কবত। এই মমতা জিনিসটি ক্রমে ক্রমে সঞ্চাবিত হয। নতুন চাকব যতই কাজেব হোক, এই জিনিসটি তাব কাছ থেকে পাব না। মাইনে দিযে কাজ পাওযা যায না। যাক, একবকম ক বে চলে যাবে।"

এই "প্বাতন ভৃত্যদেব" মধ্যে মোবাবক খানসামাব কথাও পাওযা যায তাঁব লেখায। এবা কবিব মনে এতটা স্থান কবে নিযেছিল যে তাঁব সাহিত্যেব মধ্যে চিঠিপত্রে ছাডাও—কাব্যে গল্পে, উপন্যাসে নাটকে এদেব স্বনামে বেনামে আবির্ভাব দেখা যায। তাদেব মধ্যে সবচেযে মহৎ ও উজ্জ্বল চবিত্র 'বাজা ও বানীব" শঙ্কব এবং 'বৈকুণ্ঠেব খাতাব" ঈশেন, তাবপবে কাব্যে আছে আমাদেব চিবপবিচিত কেষ্টা আব সেই সদ্য কন্যাহাবা ঝাডন-স্কন্ধে প্রাতে-দেখা-দেওযা ভৃত্যটি সবশেষে এসেছে স্বনামধন্য বনমালী, কবিব শেষ বিশ বৎসবেব সেবাসঙ্গী এবং তাবও পবে এসেছে মহাদেব। কবি-প্ত্রবধ প্রতিমা দেবী বার্ধক্যেব দশায ছিলেন কবিব "মা মণি", জননী স্বব্পা। কিন্তু তিনিও নিজে ভগ্নস্বাস্থ্যে কাতব থেকে কবিপবিচর্যায সব সমযে ইচ্ছান্ব্প নিয্ক্ত থাকতে পাবতেন না। তাব তত্ত্বাবধানে এই দ্টি চিববিশ্বস্ত ভৃত্য সেবা যত্নে কবিব জীবনকে সহজ ও স্বচ্ছন্দ কবে তুলেছে। হৃদযেব দিকেও যে এবা কবিব মনে কত সবসতা জ্গিযেছে, তাঁব স্খ স্বাচ্ছন্দ্যেব জন্য কতখানি কবেছে তা তাঁব নানা বচনাতেই প্রকাশ পেযেছে। বনমালীব সম্বন্ধে ভান্সিংহেব পত্রাবলীতে এক জাযগায লিখেছেন,– এবাবে সাধ্চবণেব সঙ্গ ও সেবা থেকে বঞ্চিত আছি। বনমালী নামধাবী উৎকলবাসী সেবক বৌমাব আদেশক্রমে এসেচে। সে সর্বদাই ভযে ভযে আছে। সবচেযে ভয আমাকে, অথচ আমি বিশেষ ভযংকব নই। দ্বিতীয ভয পাছে বাজবাডিব অন্নপানে বিদেশে গঙ্গাতীব হতে দ্ববর্তী দেশে

অকালমৃত্যু ঘটে। তৃতীয় ভয়, রেলগাড়িতে বিদেশীয় জনতাকে—তারা ওর সঙ্গে হিন্দি বলে, ও বলে বাংলা,—তাতে কথোপকথন উভয়পক্ষেই দুর্বোধ হয়ে ওঠে। ওর বিশ্বাস, এজন্য বিদেশীরাই দায়িক। ওর আর-একটা বিশেষ গুণ এই যে, ওকে যদি কোনো কাপড় বের করে দিতে বলি তাহলে সিন্দুক থেকে একে একে সব কাপড় বের ক'রে তবে সেটা নির্বাচন করতে পারে, আবার সবগুলো তাকে একে একে ফিরে গোচাতে হয়। মানুষের আয়ু যখন অল্প, সময় যখন সীমাবদ্ধ, তখন এরকম চাকর নিয়ে মর্ত্যলোকে অসুবিধায় পড়তে হয়। ওর একটা মস্ত গুণ এই যে, ও ঠাট্টা করলে বুঝতে পারে, ঠিক সময়ে হাসতে জানে; আমার 'লেট ল্যামেনটেড' সাধুচরণের সে বালাই ছিল না। আমার আবার স্বভাব এমন যে, ঠাট্টা না করে বাঁচিনে, তাই ও যতক্ষণ কাপড় বের করচে আর গোচাচ্ছে, আমি ততক্ষণ সেই সুদীর্ঘ সময় ঠাট্টা করে অতিবাহন করি। যাই হোক, ওকে বিদেশী হাওয়া, বিদেশী খাওয়া, বিদেশী ভিড় থেকে ফিবে নিয়ে গিয়ে কোনোমতে বৌমার হাতে আস্তটি ফিরে দিতে পারলে নিরুদ্বিগ্ন হই। আমার যে কত বড়ো দায়িত্ব, সে ওকে না দেখলে ভালো করে অনুধাবন করতেই পারবে না। একে আমার বিশ্বভারতী, তার উপর বনমালী। ভাবনার আর অন্ত নাই।" ঘরের লোকের সঙ্গে নিয়ত ঘনিষ্ঠ না থেকে এদের যোগে কবির জীবন চলায়, কবির স্বভাব কর্মপ্রবণ হয়েছে বেশি, বহির্মুখী চিন্তা ভাবনার মধ্যেই মন ঘুরেছে সব সময়। ঘরোয়া পরিবেশে এসে মন বেশি বিশ্রম্ভালাপের বা খুঁটিনাটি কাজের অবকাশ নেয়নি।

জনগণের মাঝে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে তাঁর জীবনের অঙ্গ হিসেবে জনসাধারণের কথা যেখানে বেশি ভিড় করেছে সে হচ্ছে 'ছিন্নপত্র' ও 'ছেলেবেলা'। এদিক দিয়ে বই দুটির বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। কবি নিজে এই বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি দেননি বা কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি, লিখে গিয়েছেন তিনি অন্য তাৎপর্যে, স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে। তাঁর পাঠকদের কেউ এ-বিশেষত্ব লক্ষ্য করে থাকলেও সাহিত্যে কোথাও এইদিক দিয়ে বই দুখানির আলোচনা কেউ করেছেন কি না জানিনে, অথচ জনগণের কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পেতে হলে বই দুখানির অপরিহার্যতা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

'ছিন্নপত্র' সঙ্কলনের প্রায়-পত্রেই বিশেষ করে ধরা দিয়েছে সাধারণের সাধারণ কথা। সেই 'সাধারণেরা' তত্ত্ব বা তথ্য-অন্তর্গত ফাঁপা মানুষ নয়, চোখে-দেখা কথা-বলা রক্ত-মাংসের মানুষ। কবি এখানে প্রধানত দ্রষ্টা। ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে। "পথচলা মনে সেই সকল গ্রামদৃশ্যের নানা নতুন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল, তখনি তখনি তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে।"

এখানে মানুষের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার মনিব বা জমিদার হিসাবে বাইরে একটু স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন কিন্তু মননে তিনি সাধারণের অন্তরঙ্গই ছিলেন। কবি বলছেন—"আমাদের এখানে যারা আছে, আমি জানালায় দাঁড়িয়ে প্রায় তাদের কাজকর্ম দেখি।...এদের ঠিক অবস্থাটা ঠিক মনের ভাবটা ভারি জানতে ইচ্ছে করে।...আমার এই খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে নানা দৃশ্য দেখতে পাই। সবসুদ্ধ বেশ লাগে।"

'ছিন্নপত্রে'র প্রকৃতিও ছিন্নপত্রের মানুষের সামিল,—কোথাও মূক, কোথাও মুখর। মানুষের হাসিকান্নার সঙ্গে এদের হাসিকান্নার সুর মেলে। পশুপক্ষী, জলস্থল, তৃণগুল্ম, আকাশ বাতাস এদের সবাইকেই একটি মূলভাব সূত্রাকারে ভিতবে ভিতরে মিলিয়ে রেখেছে:—সে ভাবটি করুণ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় যে ভাবটি জাগে সেটি হচ্ছে করুণার ভাব। এই করুণাতেই কবিচিত্ত প্রকৃতির বুকের মানুষগুলির প্রতি বিগলিত ধারায় প্রবাহিত। কবি বলছেন—"এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারি মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশু-সন্তানের মতো নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদেব আর গতি নেই। পৃথিবীব স্তন যখন শুকিয়ে যায়, তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে- কোনোমতে একটু ক্ষুধা ভাঙলেই আবার তখনি সমস্ত ভুলে যায়।"

প্রকৃতি এবং মানুষের সম্বন্ধে কবি অন্যত্র বলছেন,—"যেন আমি এই আকাশের, এই নদীর, এই শ্যামল পৃথিবীর। বোটে আমার এই রকম করে কাটে। প'ড়ে প'ড়ে পরিচিত প্রকৃতির কত রকমের যে ভাবের পরিবর্তন দেখি তার ঠিক নেই। এখানে আমাব আব একটি সুখ আছে। এক এক সময় এক একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম। বাস্তবিক এর সুন্দর সবলতা এবং আন্তবিক ভক্তিতে এ লোকটি আমার চেয়ে কত বড়ো।"

আর এক জায়গায় লিখছেন,—"আমার কাছে এই সমস্ত দুঃখপীড়িত

অটল বিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত প্রজাদের মুখে বড়ো একটি কোমল মাধুর্য আছে। বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে একটা সুখ আছে। এরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্য সহকারে সহ্য করেছে তবু এদের ভালোবাসা কিছুতেই ম্লান হয় না। আজ একজন এসে বলছিল,...। সে যে কেমন সহজে কোনোরকম চাতুরী না করে যেন একটা খবর দিয়ে যাবার মতো সমস্তটা ব'লে গেল তা দেখলে এই ব্যাপারটার যথার্থ গভীরতা বুঝতে পারা যায়। এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয় তা এরা জানে না। কিন্তু তবু প্যারিসের সভ্যতা থেকে কত তফাত। সে এর চেয়ে কত কঠিন কত উজ্জ্বল কত সুগঠিত। তবু এখানকার মানুষের মধ্যে যে জিনিসটি আছে সে বড়ো অনাদরের নয়। যতক্ষণ না সভ্যতার মাঝখানে এই স্বচ্ছ সরলতার প্রতিষ্ঠা হয় ততক্ষণ সভ্যতা কখনই সম্পূর্ণ এবং সুন্দর হবে না। সরলতাই মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়—সে যেন গঙ্গার মতো, তার মধ্যে স্নান ক'রে সংসারের অনেক তাপ দূর হয়ে যায়।"

কবির মনে এই জনসাধারণের প্রতি শুধু যে একটা অনুকম্পা বা সহানুভূতির ভাবই রয়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে আছে যথেষ্ট শ্রদ্ধাও। এদের অমার্জিত সরল স্বভাবের দানেরও যে একটা পরম মূল্য আছে সেই কথা জানিয়ে তিনি সভ্যজগতের দরবারে এদের একটি সুনির্দিষ্ট মর্যাদায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, ছিন্নপত্রে। শ্রদ্ধা, প্রীতি, করুণায় মাখানো নানা মানুষের নানা কথায় ভরা এই পত্রগুলি, আর সে মানুষগুলি সবই সমাজের নিম্নস্তরের। জেলে, মাঝি, লজ্জাশীলা গ্রাম্য বধূ, গোচারণরত রাখাল, বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, বেদে,—এদের ছবিই তিনি এঁকেছেন। তাদের সঙ্গে রয়েছে দারোগা, পোস্টমাস্টার, হাটুরে,

খেলায় রত গ্রামের ছেলেমেয়ের দল, জনপদবধূ, খানসামা, খালাসী, বেহারা, মুকুন্দ, চাষা, মৌলবী; আরো আছে—পূজায় গৃহসমাগত প্রবাসী চাকুরে, ভজিয়া চাকর, নারায়ণ সিং দরোয়ান, গাইয়ে যুবক, বাবুর্চি,—এরাই ছিন্নপত্রের প্রতি ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট্, সাহেব মেম, এঁরাও উদয় হয়েছেন এক এক সময়ে। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বর্ণের গরিমা নিয়ে দেখা দিলেও গায়ে তাঁদের গেঁয়ো বাতাস লেগে তাঁরাও সাধারণ মানুষের মেলায় কৌতুক শোভার অঙ্গ হয়ে গেছেন।

যে পত্রগুলিতে মানুষের কথা নেই, সেখানেও তার অভাব বোঝা যায় না।—প্রকৃতিই সেখানে মানবধর্মী। মনে হয় যেন কোনো সংবেদনশীল প্রতিবেশী বা ঘরের লোকের কথাই কবি বলে চলেছেন। অনেক জায়গাতেই তাঁর পাত্রপাত্রীরা এই মূক পল্লীপ্রকৃতিরই প্রতিচ্ছবি মাত্র। "মেঘ ও রৌদ্র", "ছুটি", "পোস্টমাস্টার" এগুলিতে এই প্রকৃতিই মানুষের মন নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষ আর প্রকৃতি যেন এখানে একাত্ম হয়ে দেখা দিয়েছে। কবি বলছেন—"পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্র মানুষ ভাবে দেখিনে। যেমন নানা দেশ দিয়ে নদী চলেছে, মানুষের স্রোতও তেমনি কলরব সহকারে গাছপালা গ্রাম নগরের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে চিরকাল ধ'রে চলেছে—এ আর ফুরোয় না। মেন্ মে কাম এন্ড মেন্ মে গো বাট্ আই গো অন্ ফর্ এভার-—কথাটা ঠিক সংগত নয়। মানুষও নানা শাখা-প্রশাখা নিয়ে নদীর মতোই চলেছে।...ওই শোনো মাঠে চাষা গান গাচ্ছে, জেলে ডিঙি ভেসে চলেছে, বেলা যাচ্ছে, রৌদ্র ক্রমেই বেড়ে উঠছে--ঘাটে কেউ স্নান করছে কেউ জল নিয়ে যাচ্ছে—এমনি ক'রে এই শান্তিময়ী নদীর দুই তীরে গ্রামের মধ্যে গাছের ছায়ায শত শত বৎসর গুণ গুণ শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে--এবং সকলের মধ্যে থেকে একটা করুণ ধ্বনি জেগে উঠছে -আই গো অন্ ফর্ এভার্।"

"পদ্মা আমাব কাছে একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো। পদ্মানদীর কাছে

মানুষের লোকালয় তুচ্ছ কিন্তু ইচ্ছামতী মানুষ-ঘেঁষা নদী ;—তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের কর্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্ছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী। স্নানের সময় মেয়েরা যে সমস্ত গল্পগুজব নিয়ে আসে সেগুলি এই নদীটির হাস্যময় কলধ্বনির সঙ্গে একসুরে মিলে যায়। আশ্বিন মাসে মেনকার ঘরের পার্বতী যেমন কৈলাস-শিখর ছেড়ে একবার তাঁর বাপের বাড়ি দেখে শুনে যান ইছামতী তেমনি সংবৎসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েক মাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিতে আসে। তার পরে ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কাছে প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত নূতন খবর শুনে নিয়ে, তাদের সঙ্গে মাখামাখি সখীত্ব ক'রে আবার চলে যায়।" ঝড়ের দিনে প্রকৃতি "নাতি সম্পর্কে মধ্যে মধ্যে একটু আধটু তামাশা করে থাকেন।" কখনো বাতাস "প্রকৃতির স্নেহ হস্তের মতো আস্তে আস্তে চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়।" কখনো "মনে হয় এই জীবন্ত ধরণী খুব নিকট থেকে নিঃশ্বাস ফেলছে।" কখনো "রুগ্ন ছেলের দিকে মা যেমন করে তাকায় প্রকৃতি সেই রকম সুগভীর স্তব্ধ এবং বিষাদের সঙ্গে মুখের দিকে চেয়ে থাকে।" এক সময় প্রকৃতি "প্রবাসে প্রণয়িনীর মতো বিচ্ছেদ কাতরা।" এই "তাঁর চোখে সুর্মার বাহার" আবার পরক্ষণেই ঝড় উঠিয়ে "রোষাবিষ্টা গৃহিণীর মতো বড়ো একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাত নিয়ে ছুটে আসে" ; আবার "শরতের সোনালী আলো দেখে মনে হয়. . নবযৌবনা ধরণী সুন্দরীর সঙ্গে কোন্-এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসা চলছে।" কখনো, এই "পৃথিবীর উপর বাৎসল্যের ভাব আসে", কখনো সে "বহু সন্তানবতী মাতা", আবার, কখনো "শুভ্রবসনা মহিমময়ী সহচরী", এক সময় ভরা বাদরে "ডাঙা ও জল দুই লাজুক প্রণয়ীর মতো অল্প অল্প ক'রে পরস্পরের কাছে অগ্রসর হচ্ছে। লজ্জার সীমা উপছে এল ব'লে- প্রায় গলাগলি হয়ে এসেছে।" এক সময়—"অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় রাত্রিতে" প্রকৃতিকে "মনে হয় যেন একটি

মর্মময় বৃহৎ গোরের উপরে একটি সাদা কাপড়পরা মেয়ে উপুড় হয়ে মুখ ঢেকে মূর্ছিতাপ্রায় নিস্তব্ধ পড়ে রয়েছে।" সন্ধ্যা তারাটি দেখা দেয় "ঘরের গৃহলক্ষ্মী, দেয় সে স্নেহস্পর্শ", "ভোরের বেলায় প্রথম দৃষ্টিপাতে শুকতারাটিকে একটি বহুপরিচিত সহাস্য সহচরী না মনে ক'রে" থাকতে পারা যায় না। "এই প্রকৃতি নামক একটা বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কখন্ যে কী হচ্ছে তার হিসেব পাওয়া শক্ত—কোথায় তার কোন অজ্ঞাত কোণে কী একটা কাণ্ড ঘটছে আর অকস্মাৎ চারদিকের সমস্ত ভাবখানা বদলে যাচ্ছে। মানুষের মনখানাও ঠিক ঐ প্রকাণ্ড প্রকৃতির মতো রহস্যময়। চতুর্দিকে শিরা উপশিবা স্নায়ু মস্তিষ্ক মজ্জার ভিতব কী এক অবিশ্রাম ইন্দ্রজাল চলছে—হুহু শব্দে রক্তস্রোত ছুটেছে স্নায়ুগুলো কাঁপছে হৃৎপিণ্ড উঠছে পড়ছে, আর এই রহস্যময়ী মানব-প্রকৃতির মধ্যে ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে।" বাইরের এই প্রকৃতি কবির কাছে কখনো "সর্বগ্রাসী রহস্যময়ী". কখনো "প্রকৃতি-সুন্দরী কুতূহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মতো দরজার কাছে উঁকি মারছে।' এক জায়গায় এই প্রকৃতি সন্ধ্যাব রূপ নিয়ে বৃহৎ জনতা-জীবনেব চিবন্তন কলধ্বনি শুনিয়ে কবি-হৃদয়কে আবিষ্ট কবে তুলছে। কবি লিখছেন- "সন্ধ্যা বেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়াঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ওপার থেকে জনকতক লোক বাঁয়াতবলার সঙ্গে গান গাচ্ছে. একটা মিশ্রিত কলরব কানে এসে প্রবেশ করছে. বাস্তা দিয়ে স্ত্রীপুরুষ যাবা চলছে তাদের ব্যস্তভাব; গাছপালার ভিতর দিয়ে দীপালোকিত কোটাবাড়ি দেখা যাচ্ছে, খেয়াঘাটে নানাশ্রেণীব লোকের ভিড। আকাশে নিবিড একরঙা মেঘ, সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে; ওপারে সারবাঁধা মহাজনী নৌকায় আলো জ্বলে উঠল, পূজাঘর থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসব ঘণ্টা বাজতে লাগল.—বাতি নিবিয়ে বোটের জানলায় বসে আমার মনে ভারি একটা অপূর্ব আবেগ উপস্থিত হোলো। অন্ধকারেব আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বুক্ষেব

উপর এসে আঘাত করতে লাগল। এই মেঘলা আকাশের নিচে, নিবিড় সন্ধ্যার মধ্যে, কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্য,—মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শত সহস্র প্রকারের ঘাত-প্রতিঘাত। বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালোমন্দ সমস্ত সুখদুঃখ এক হয়ে তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুইতীর থেকে একটি সকরুণ সুন্দর সুগম্ভীর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগল।"

অনেক সময় ধাঁধা লাগে যে এ-বইয়ে মানুষই প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করেছে, না, প্রকৃতি মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে নিজের ছাঁচে গড়ে তুলেছে। মানুষ আর প্রকৃতির সম্বন্ধটি এতই নিবিড় ও একাত্ম। কবির লেখায় এরা দুইই সমপ্রাণধর্মী জীব, প্রকৃতিও জনতারই অঙ্গ।

এদের দুয়ের জন্যই তিনি সমান অনুভব করেন, মানুষের সুখে-দুঃখে যেমন, প্রকৃতির ভিতরে ঋতুপরিবর্তনে বা বিপর্যয়েও তেমনি তাঁর অন্তরে বিচিত্র রূপান্তর দেখা দেয়।

তিনি জমিদার,—নায়েব, আমলা, পাইক, বরকন্দাজ নিয়ে কাছারিতে তাঁর নিয়মিত অধিষ্ঠান; প্রধানত খাজনার তদারক, বিলিব্যবস্থা, মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা, কৈফিয়ত তলব, বিচারবিবেচনাই তাঁর কাজ। তিনি আছেন তাঁর দপ্তর নিয়ে সেই বাঁধা কাজের সুখসম্মানের গদিতে আর জনসাধারণ আছে তাদের চিরন্তন দারিদ্র্য নিয়ে দুর্দশার নিদারুণ অতলে। দুইস্তরে বাঁধা রীতিতে চলেছে এই দুই অসম জীবনধারা। আমাদের দেশে এর পরিবর্তনের ঢেউ সবেমাত্র লেগেছে। শ্রেণীবৈষম্য দূর করবার যে আন্দোলন আজ বাইরের জগতে ছড়িয়ে পড়েছে, সেই স্যোশ্যালিজ্‌ম্‌ বা সাম্যবাদের চিন্তাধারা এ সময়ে এই নিভৃত জনপদে আলোড়ন তুলেছে এসে কবিমানসে। একটু যেন আশ্বাসের ইঙ্গিতও দিয়েছে। জনগণের দুঃস্থ জীবনসমস্যা-সমাধানে উদ্বিগ্ন তিনি

এ সম্পর্কে বলছেন—"সোশিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীর ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানিনে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগ্য। কেননা পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র, একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখ মোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিরাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে কোনোকালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবন-ধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যক জিনিসও বণ্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব, অমূলক কল্পনামাত্র, কখনই সকল মানুষ খেতে পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই, তারা ভারি কঠিন কথা বলে। কিন্তু এ সমস্ত সামাজিক সমস্যা এমন কঠিন!"

গ্রামের সরল প্রকৃতি এবং সরল মানুষের পরিবেশে কবির নিজের জীবনধারাও সরল না হয়ে পারেনি, যার ফলে তখন তাঁর চিন্তা ও রচনাতেও সরল অনুভূতিই স্থান পেয়েছে। উন্নতির উচ্চ শিখরে ওঠবার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা এসে তখনও তাঁর জীবনে স্থানকালপাত্রের জটিলতা বা রচনায় দুরূহতা সৃষ্টি করেনি। তিনি বিশ্বকবি হবার দুর্লভ সম্মান লাভ করলেন, বিশ্বের বৃহৎ জীবনসংঘাত খরপ্রবাহ বেগে তাঁকে নিয়ে চলল উচ্চ হতে উচ্চস্তরে। তাঁর মধ্যে জনতার সঙ্গে কবির যোগসূত্র সাময়িকভাবে ছিন্ন হয়ে গেল।

অতুল কীর্তিমণ্ডিত জয়যাত্রাশেষে বহুদিন পরে জীবনের প্রাক্ যবনিকা অঙ্কে তাঁর সাহিত্যে আর-এক ক্ষেত্রে জনগণের দেখা মেলে। সে ক্ষেত্রটি হচ্ছে 'ছেলেবেলা'। 'ছিন্নপত্রে' কবি দেখছেন মানুষ ও প্রকৃতিতে গড়া একটি জনতাকে, 'ছেলেবেলা'য় কবি জনতার সঙ্গে সঙ্গে দেখছেন তাঁর নিজেকেও। আজীবন তিনি সহজ সরল মানুষ, এবং এই সহজের পথেই জনতা এসেছে তাঁর সাহিত্যে, "লেখকের কাছঘেঁষা

জগতের দৈনিক ছায়া প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি প্রতিধ্বনি" সমেত সেই পরিচয় নিয়ে আছে 'ছিন্নপত্র', জীবনের অন্তেও যখন চক্রাবর্তনে ফিরে গিয়েছেন তিনি সেই সহজের পথে, তখনও জনতাই তাঁব অন্তর জয় করেছে ;— তারই কাহিনী আছে 'ছেলেবেলা'য়।

'ছেলেবেলা'তে উচ্চনীচের মান-অপমানের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে কবি এসে পেঁৗছেছেন এমন একটি উদার নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকায়, যেখানে মন শান্ত, নির্বিকার, পৃথিবীর প্রতি সকৌতুক কৌতূহলে ও প্রেমে প্রসন্ন। এখানে এসে আপন জীবনকে সামনে মেলে ধরে তিনি তার সহজ সরল মহিমার উপলব্ধিতেই নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। পট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক-একটি মানুষ, এক একটি ঘটনা, হোক তারা গণ্য বা নগণ্য, চোখের সামনে এনে এনে দেখছেন। জীর্ণতা ও ক্লান্তি দিয়েছে দেহ ও মনের পরিক্রমা-পরিধিকে সুনির্দিষ্ট ক'রে, কিন্তু ঠেকাতে পারেনি মনের দিগ্‌দর্শন-প্রবণতাকে। তাই মন আছে তখনো বিচরণশীল। তবে, সেই বিচরণ আগের মতো তেমন আর নতুন নতুন দেশে নয়, ছিন্নপত্রের মতো নৌকায় করেও নয়, জানলা দিয়ে দৃষ্টির ভেলায় পল্লীপথেও নয়। মনোবাজ্যে ফিবে গিয়েছেন কবি তাঁর 'ছেলেবেলা'য়। কিন্তু তাকে দেখেছেন নতুন দৃষ্টিতে। তাতে বিষয়-বস্তুর রং ফিরেছে, স্বাদেও এসেছে বৈচিত্র্য।

ছুটিতে বাইবে যাবাব ইচ্ছে রয়েছে তীব্র, কিন্তু যাওয়া হচ্ছে না, অতএব পুরোনো অভ্যস্ত আবাসে থেকেই দৃষ্টি বদলে নিয়ে দেশভ্রমণের সাধ মিটিযে নেওয়াব এই কৌশল বা জাদুসৃষ্টির পরিচয় তাঁর রচনার আরো অনেক জাযগাতেই আছে। শেষ বয়সে অনুরূপ ঘটনা দেখা যাবে 'পত্রপুটে'। তাঁব 'ছুটি' কবিতাটি সেই পুরোনোর মধ্যে থেকেই নতুন মায়ারাজ্য আবিষ্কারের কাহিনী। 'ছেলেবেলা'য় ঘটেছে এই জাদু। শেষ জীবনে লেখা কবিতাগুলিতেও প্রায়ই দেখা যাবে ছেলেবেলাব কথা। তবে, জনসাধাবণের কথায় বেশি মুখব তাঁব এই বইখানিই।

মধ্যবয়সের লেখা 'জীবনস্মৃতি' আর এই 'ছেলেবেলা'তে ছেলেবেলাকার মূল ঘটনা-অংশ প্রায় একই, কিন্তু দৃষ্টি এবং প্রকাশ-ভঙ্গিতেই তাদের বিশেষত্ব। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি সম্মান-সচেতন। তিনি তখন মহাকবি – তাঁর মহান এবং সার্থক জীবনকে সামনে রেখেই তিনি তুলি চালিয়েছেন তাঁর জীবন-আলেখ্যে। এই যে একটি বৃহৎ সার্থকতা–স্তরে স্তরে রেখার টানে টানে তারই রহস্যকে উদ্ঘাটিত করে উপহার দিয়েছেন তিনি তাঁর পাঠক-সমাজকে। নিজেই সেখানে প্রকাশের লক্ষ্য, আর যা-কিছু, সব হচ্ছে তাঁকে ফোটাবারই উপলক্ষ্য মাত্র।

জীবনস্মৃতির ঘটনা বা মানুষগুলি যেন কবির উন্নতির পথে এক একটি ধাপের মতো। বড় হোতে হোতে উপরে ওঠবার মুখে তাতে পা ফেলে ফেলে তিনি উঠছেন। তাঁর এই জয়যাত্রায় ছোটো ঘটনার যেমন স্থান নেই, সমাজের একটা বড়ো অংশ 'ছোটো-লোকেরা'ও সেখানে প্রায় নিখোঁজ। কিন্তু যখন মান-অপমানের দরজা পেরিয়ে খোলা মাঠে খোলা গায়ে জীবনসায়াহ্নে বুড়ো মানুষটি তাঁরই মতো জীবনভার বর্জিত ছেলেদের সঙ্গে সংসারের পাঁচদশটা কথা নিয়ে গল্পগুজবে অবসর যাপন করছেন, তখন দেখি বয়সে ছোটোদের মধ্যে সমাজের সেই 'ছোটো' লোকেরাই নিয়েছে তাঁর কথার বড়ো অংশ। নিজে যে একজন প্রতিষ্ঠাবান বড়োলোক,—'ছেলেবেলা'য় এই চেতনাটা প্রকট নয়, এখানে তিনি প্রতিষ্ঠামোহমুক্ত। এখানে তাঁর 'আমি'কে রেখেছেন সকলের কথা বলতে। সকলের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন তিনি। গল্পের সুতোয় সকলকে একসঙ্গে গেঁথেছেন মালার মতো।

অনুরোধ ছিল ছেলেদের উপযোগী গল্প রচনার। ছেলেরা সহজ মানুষ সহজ কথাই তারা বোঝে; বয়সের সহজ আমেজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কবি বেছে নিয়েছেন তাঁর ছেলেবেলার গল্প। সেখানেও যারা সহজ মানুষ, সহজে যারা তাঁর মনোলোকে প্রবেশ করেছিল, এবার মন খুলে বলে চললেন তাদেরই সহজ জীবনের সহস্রকথা। এদের জীবনে চিন্তার

জটিলতা নেই, কাজ-কারবার মোটামোটা, চালচলনও সাদাসিদে, ছোটোখাটো সুখদুঃখ নিয়ে এরা হাসে কাঁদে,—একরকম ক'রে জীবন কাটিয়ে দেয়। প্রাণের টান এদের মূল বন্ধন। সেই আত্মীয় সম্বন্ধের উপর এদের সমাজ সংস্কৃতির ভিত্তি। এদের টুক্‌রোটাক্‌রা কথা যা আছে, ঘোরপ্যাঁচ খেলবার অবকাশ তাতে কম, ছাঁকাছাঁকা করে বলতে গেলেও তাতে দরদের ছোঁয়া লেগে যায় আপনিই, আর নিরাভরণ নিঃস্ব হয়েও আন্তরিকতার সহজ মাধুর্যের গুণেই এরা ছেলেবুড়ো সকলের মনে স্থান করে নিতে পারে। জনসাধারণের সঙ্গে একদিক দিয়ে ছেলে ও বুড়োদের মিল আছে খুব বেশি। চিন্তায় এবং জীবনের বাস্তব দিকে এদের দুয়েরই স্বভাব সহজ সরল। স্বভাবের মিল কবিকে শেষ বয়সে জনজীবনের অনুরাগী করে তুলেছে। এইজন্যেই মধ্যবয়সে একবার 'জীবনস্মৃতি' লিখেও বৃদ্ধ বয়সে কবি যখন ছেলেদের গল্প বলতে গেলেন তখন বললেন নিজের জীবনেরই সেই সবচেয়ে সহজ সরল সব গল্প যাতে জনসাধারণ আছে হৃদয়-রসে মিশিয়ে। বইয়ের বিষয় যেমন সহজ, ভাষাও তেমনি।

'ছেলেবেলা' সাধারণ মানুষের শোভাযাত্রার চলচ্চিত্র। দরোয়ান, সইস, দরজি, ফেরিওয়ালা, এদের মধ্যে মিশে চলেছেন কবি নিজেও। কীই বা এতে ঘটনা, "সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলেব আলো।" "মাস্টারমশায় মিট্‌মিটে আলোয় পড়াতেন প্যারি সরকারের ফার্স্ট বুক।" "কোন্‌ দাসী কখন্‌ হঠাৎ শুনতে পেত শাঁকচুন্নির নাকিসুর, দড়াম করে পড়ত আছাড় খেয়ে।" "বেহারা বাঁখে করে কলসী ভ'রে মাঘ ফাল্গুনের গঙ্গার জল তুলে আনত।" শুধু কয়েকটি ছাঁকা কথা, কোনো উচ্ছ্বাস নেই, লেখকের দিক থেকে এদের ভালোমন্দে সুখ-দুঃখে ধরা দেবার প্রত্যক্ষ কোনো প্রয়াস নেই,—তবু, ঐ শব্দগুলির নিরলংকার সহজ প্রয়োগ-কৌশলেই হোক অথবা জীবনের সঙ্গে গল্পগুলির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকার দরুনই হোক,

পড়লেই পাঠকের মনে মানুষগুলি জলজ্যান্ত হয়ে ওঠে, তাদের সুখ-দুঃখের করুণ ছোঁয়াচ এসে লাগে;—চোখের উপর এরা চলাফেরা করছে—লেখকও হয়ে পড়ছেন তাদেরই একজন, পাঠককেও ভুলে যেতে হয় তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং পরিবেশ। মন মিলিয়ে ওদের জীবনে ওদের সঙ্গেই চলতে ইচ্ছে করে, দেখতে ইচ্ছে করে জনতার এই বিচিত্র কার্য-কলাপ। লেখকের সঙ্গে পাঠকেরও মন ঘোরে সেই পরিবেশে যেখানে "বাড়িভরা ছিল লোক, আপন পর কত তার ঠিকানা নেই; নানা মহলের চাকর দাসীর নানাদিকে হৈ হৈ ডাক।

"সামনের উঠান দিয়ে প্যারিদাসী ধামা কাঁখে বাজার ক'রে নিয়ে আসছে তরিতরকারি, দুখন বেহারা বাঁখ-কাঁধে গঙ্গার জল আনছে বাড়ির ভিতরে চলেছে তাঁতিনী নতুন ফ্যাশান-পেড়ে শাড়ির সওদা করতে, মাইনে-করা যে দিনু স্যাকরা গলির পাশের ঘরে ব'সে হাপর ফোঁস ফোঁস ক'রে বাড়ির ফরমাশ খাটত, সে আসছে খাতাঞ্চিখানায়, কানে পালখের কলম গোঁজা কৈলাস মুখুজ্জের কাছে, পাওনার দাবি জানাতে, উঠোনে বসে টং টং আওয়াজে পুরোনো লেপের তুলো ধুনছে ধুনুরী। বাইরে কানা পালোয়ানের সঙ্গে মুকুন্দলাল দারোয়ান লুটোপুটি করতে করতে কুস্তির প্যাঁচ কষছে। চটাচট শব্দে দুই পায়ে লাগাচ্ছে চাপড়, ডন ফেলছে বিশপঁচিশবার ঘন ঘন। ভিখিরির দল ব'সে আছে বরাদ্দ ভিক্ষার আশা ক'রে।"

এমনি পরিবেশেই এসেছে 'বিশ্বনাথ শিকারী', এসেছে 'আবদুল মাঝি' তাদের মজার মজার গল্প নিয়ে। যাত্রার আসরে দেখা দিয়েছে "ছেলে-গুলো লম্বা চুলওয়ালা, চোখে কালিপড়া, অল্পবয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে, পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে রং করা টিনের বাক্সোয়। দেউড়ির দরজা খোলা, উঠোনে পিল পিল্ করে ঢুকে পড়ছে লোকের ভিড়। চারদিকে টগ্‌বগ্ করে আওয়াজ উঠছে, ছাপিয়ে পড়ছে গলি পেরিয়ে চিৎপুরের রাস্তায়।

এই যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটোয় ঘ্যাঁষাঘেঁষি। তাদের বেশির ভাগ মানুষই ভদ্দরলোকেরা যাদের বলে বাজে লোক।"

গৃহে মেয়েদের মজলিস. "চণ্ডীমণ্ডপে ..গুরুমশায়ের পাঠশালা", "এক-একদিন বাড়ির আঙিনায় আসে ভালুক-নাচওয়ালা। আসে সাপুড়ে সাপ খেলাতে। এক-একদিন আসে ভোজবাজিওয়ালা. একটু দেয় নতুনের আমেজ।"

সব কিছুই ছোটো ছোটো, বড়ো কিছুর ডাক নেই এর মধ্যে। কিন্তু এরা একটি প্রাণলোক গ'ড়ে তার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

পাতায় পাতায় পংক্তিতে পংক্তিতে সমাজের এই সাধারণ স্তরের লোকদের এমনি সব গল্প. বইয়ের অর্ধেকের উপর চলেছে একটানা। অবশ্য তিনি তা বলেছেন গল্প বলার জন্যই গল্প লেখকের মন নিয়ে,- শ্রেণী-সচেতন আধুনিক সাহিত্যিকের মতো বিশেষ ক'রে ছোটোদের কথাই বলবেন ব'লে নয়। এদের প্রতি একটি অন্তর্নিহিত দবদের পরিচয়ই বহন করে এই সহজ বর্ণনাগুলি। কবির মনে যে এক সময়ে এরাও বসউৎস জাগিয়েছিল তারই বিশিষ্ট প্রমাণ 'ছেলেবেলা'।

কবির জীবনে এই ছোটোদের থেকেও যে বড়কথা কিছু আসেনি এমন নয। 'গল্পগুচ্ছে'র কথা ছেড়ে দিলেও পরিণত বয়সের রচনা 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'তে দেখা যায় এদের জীবনছবি থেকে অনেক উচ্চ তত্ত্বালোচনার সূত্রপাত হয়েছে। 'পঞ্চভূতে'র পাত্রগুলি রূপক হোলেও ঘটনাগুলি বাস্তব, এবং তা কবির জীবনেবই ঘটনা। জমিদারের পুণ্যাহের কথাসূত্রে জেগেছে 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ'. পল্লীগ্রাম দেখে দেখে রূপ দিয়েছেন 'পল্লীগ্রামে'র, গৌরবহীন একটি ক্ষুদ্র মুহুরীজীবন লেগেছে 'মনুষ্য' আলোচনাটির কাজে, 'মন'-এর কথায় এসেছে 'ছিন্নপত্রে'ব আমাদের সেই পূর্বপরিচিত ভৃত্য নারায়ণ সিং।

শান্তিনিকেতনের জীবনেও এই উচ্চচিন্তার ক্ষেত্রে সাধারণের সংস্রব মন্দিবের কয়েকটি ধর্মব্যাখ্যানে উল্লিখিত হয়েছে। লিখেছেন—

—"এই মাঠ জুড়ে নানা লোকের নানা স্বতন্ত্র প্রয়োজনের নানা কলরবের মধ্যে যখন শুনলুম একজন গান গাচ্ছে, "হরি আমায় বিনামূল্যে পার করে দাও" তখন সেই গানটির ভিতর এই সমস্ত কলরবের মাঝখানটির কথা আমি শুনতে পেলুম।"—এই একজনের গান কয়েকটি ব্যাখ্যানেরই উৎসস্থল।

একটি ব্যাখ্যানে আছে—"বহুকাল পূর্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান শুনেছিলুম, 'আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।' সে আরো গেয়েছিলো, 'আমর মনের মানুষ যেখানে, আমি কোন সন্ধানে যাই সেখানে?' তার এই গানের কথাগুলি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

কবির বিখ্যাত 'আত্মবোধ' নামক ধর্মব্যাখ্যানটির সূত্রপাতটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য,—"কয়েকদিন হোলা পল্লীগ্রামে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের ধর্মের বিশেষত্বটি কী আমাকে বলতে পারো?' তাবা যা বললে, তার অনুধ্যান থেকেই দাঁড়াল এই 'আত্মবোধ'।"

'ছেলেবেলা'রই কাছাকাছি রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের শেষ গল্পগ্রন্থ 'গল্পসল্প'-তেও আছে চলতি ঘটনা নিয়ে কয়েকটি আলাপ প্রতিলাপ—অবশ্য তা গল্পের আকারে। তার মধ্যেও এই সাধারণ মানুষেব দেখা মেলে।

খুঁজলে দেখা যাবে কবির জীবনে ও সাহিত্যে জনসাধারণের এই বাস্তব ও প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা নানা প্রসঙ্গের আড়ালে অনাড়ম্বরে গা ঢাকা দিয়ে আরো হয়তো আছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সেদিন পর্যন্ত ভ্রান্ত ধারণার অভাব ছিল না। তিনি ধনীর ঘরে জন্মেছেন এবং ধনিসমাজে মানুষ হয়েছেন বলে অনেকে তাঁকে জনবিমুখ ঐশ্বর্য-বিলাসী মনে করতেন। এ-রকম ধারণাব একমাত্র কারণ অপরিচয়। যাঁরা তাঁর জীবনের ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা জানেন ভোগাড়ম্বরকে তিনি চিরদিন অশ্রদ্ধা করেছেন এবং জনসেবা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেও তাঁর দান বিরাট। কেবল ভাবোন্মাদ দেশের মুক্তি আনতে পারবে না বলেই শহরের বক্তৃতামঞ্চ থেকে দূরে পল্লীভূমিতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জাতিগঠনের ভিত্তি। ভাবে ও কর্মে জনগণের অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন তিনি।

সুধীরচন্দ্র কর সুদীর্ঘ প'চিশ বছর কাটিয়েছেন শান্তি-নিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। গ্রহণোন্মুখ তাঁর চিত্ত প্রেরণা পেয়েছে, প্রাণ আহরণ করেছে, মহা-মানবের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব থেকে। জনসাধারণের জন্য রবীন্দ্রনাথ কি ভেবেছেন, কি করেছেন তার বহু পরিচয় মিলবে এই গ্রন্থে। অভিজ্ঞতার আলোকে এবং অনুভূতির স্পর্শে শ্রদ্ধাদীপ্ত এই আলোচনা রবীন্দ্র-জীবনের একটি অনতিপরিচিত দিককে উজ্জ্বল করে তুলেছে সাধারণ সমক্ষে।